আল্লাহু সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

ভূমিকা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশের শুধু প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দলই নয়, বাংলাদেশের রাজনীতির মূলধারাও। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাস একসূত্রে গাঁথা। আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে ২৩ জুন তৎকালীন পাকিস্তানের প্রকৃত অর্থেই প্রথম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জন্মলগ্নে দলের নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। দলীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণের মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' নামকরণ করা হয়। জন্মলাভের পর থেকেই এই জনপদে বিগত ৬৮ বছর ধরে সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতির সমন্বয় এবং রাজনীতিতে সততা ও সম্প্রীতির আদর্শকে আওয়ামী লীগ সর্বদা ধারণ করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাসহ বাঙালি জাতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ অর্জন, তার মূলে রয়েছে জনগণের এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব। তাই আওয়ামী লীগের ইতিহাস, বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল অর্জন ও সংগ্রামের ইতিহাস। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রাণপুরুষ।

জন্মলগ্ন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ-অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, শোষণমুক্ত সাম্যের সমাজ নির্মাণের আদর্শ এবং একটি উন্নত সমৃদ্ধ আধুনিক, প্রগতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দর্শনের ভিত্তি রচনা করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। সাত দশকের লড়াই-সংগ্রামের অভিযাত্রায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের ন্যায্য দাবি আদায়ের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক ধাঁচের রাষ্ট্রযন্ত্রের দুঃশাসন, শোষণ ও জাতি নিপীড়নের নিগড় থেকে বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামে এই দল ধারাবাহিকভাবে নেতৃত্ব

প্রদান করেছে। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের আন্দোলন, যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, আইয়ুবের এক দশকের স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলন, '৬২ ও '৬৪-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ঐতিহাসিক ৬-দফা আন্দোলন, '৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ৬-দফাভিত্তিক '৭০-এর নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" খ্যাত কালজয়ী ভাষণ ও পরবর্তীতে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন, ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যার পর ২৬ মার্চে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানি কারাগারে বন্দি করা হয় এবং দেশদ্রোহী মামলা দিয়ে ফাঁসির আদেশ দেয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ১০ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন এবং ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় (পরবর্তীতে মুজিবনগর) শপথ গ্রহণ করে নির্বাচিত সরকার। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন এই সরকারের অধীনে দীর্ঘ ৯ মাস অসীম-সাহসীকতার সাথে লড়াই করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাঙালি জাতি। প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্নের ফসল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন তিনি।

কিন্তু বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন বছর সাত মাসের মধ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিবেদিত ঠিক সেই মুহূর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তার সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালি জাতির হারানো গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের এক নবতর সংগ্রামের পথে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পথপরিক্রমায় অনেক অশ্রু, ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি ফিরে পায় 'ভাত ও ভোটের অধিকার'। আজ বঙ্গবন্ধু-কন্যা, রাষ্ট্রনায়ক জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ও সুদক্ষ রাষ্ট্র পরিচালনায় সুশাসন, স্থিতিশীল অর্থনীতি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নয়নে গতিশীলতা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, খাদ্য নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়নসহ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়নের ফলে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শক্তির উৎস জনগণ, শক্তির উৎস সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। নেতা-কর্মীদের ইস্পাতদৃঢ় মনোবল এবং ঐক্যবদ্ধতার ফলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র সফল হয়নি, কোনোদিন হবেও না। দীর্ঘ এই পথ-পরিক্রমায় দ্ব্যর্থহীনভাবেই এ কথা বলা যায়, এ দেশের সকল গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল আন্দোলনের সাহসী মিছিলের নাম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

ইতিহাস যেমন একদিনে রচিত হয় না, তেমনই একটি রাজনৈতিক দলও দীর্ঘ সময় পরিসরে গড়ে ওঠে, পরিণত, বিকশিত ও বিস্তৃত হয়। আবার প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের থাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মসূচি– যা দলের কাউন্সিলে নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের 'কাউন্সিল' হচ্ছে দলের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সংস্থা। একটি দল, তার নীতি-আদর্শ, নেতৃত্ব, রাজনৈতিক লক্ষ্য, কর্মসূচি, ভূমিকা ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রে কাউন্সিলের কোনো বিকল্প নেই।

জনগণের ভেতর থেকে উত্থিত একটি প্রগতিশীল সংগ্রামী রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ হচ্ছে সমাজের অগ্রসর চিন্তা-চেতনা, আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রবাহিনী। মৌলিক লক্ষ্যসমূহ অপরিবর্তিত থাকলেও সময়ের বিবর্তনে দলের চিন্তাধারা, কর্মসূচি, কৌশল এবং গঠনতন্ত্রও যুগোপযোগী করতে হয়, যা একটা চলমান প্রক্রিয়া। এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অতীতেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রায় প্রতিটি কাউন্সিলেই দলীয় গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও সংযোজন করেছে। এমনকি কখনও কখনও পুরো কর্মসূচিটি পুনর্লিখিত হয়েছে। যেমনটি হয়েছিল ১৯৬৬ সালে ৬-দফা সংবলিত দলের নতুন ঘোষণাপত্রে। আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর পরিবর্তিত বাস্তবতায় প্রণীত হয়েছিল দলের নতুন গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র।

বর্তমানে সংশোধিত ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়েছে ২০১৯ সালের ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় কাউন্সিলে। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'আমার গ্রাম আমার শহর' শিরোনামে ঘোষিত 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮'-এর আলোকেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতা ও বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২১তম জাতীয় কাউন্সিল সংগঠনের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। বর্তমান ঘোষণাপত্রে সরকারের অর্জিত সাফল্যের বিবরণীর পাশাপাশি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রণীত ভবিষ্যতের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচিসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংগঠনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং দলের প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রেও প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ মুহূর্তে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন। আওয়ামী লীগের নিযুত নেতাকর্মীরা আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ।

আমি আশা করি, আমাদের সংগঠনের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা সংশোধিত ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের আলোকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে একটি প্রশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে সংগঠনের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হবে।

২১তম জাতীয় কাউন্সিল উপলক্ষে গঠিত গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র উপ-কমিটি এবং গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ওবায়দুল কাদের এমপি)
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

ঘোষণাপত্র

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের
২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক
সংশোধিত ও অনুমোদিত

The Manifesto and Programme

of
Bangladesh Awami League
as modified upto 20-21 December 2019

ড. আবদুস সোবহান গোলাপ এম.পি
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
ও
আমিনুল ইসলাম
উপ-প্রচার সম্পাদক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কর্তৃক
২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
মূল্য : টাকা ৪০ মাত্র

সূচি

প্রথম অধ্যায়

১. প্রস্তাবনা

১.১ ভূমিকা

১.২ আওয়ামী লীগের জন্ম : পটভূমি

১.৩ ভাষা সংগ্রাম থেকে মুক্তিযুদ্ধ

১.৪ মুক্তিযুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন

১.৫ স্বৈরশাসন ও প্রতিক্রিয়ার ধারা

১.৬ গৌরবোজ্জ্বল পাঁচ বছর : স্বাধীনতার সুবর্ণ সময়

১.৭ বিএনপি-জামাত জোট সরকারের দুর্নীতি, দুঃশাসন ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ

১.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল : গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও উত্তরণ (অক্টোবর ২০০৬-জানুয়ারি ২০০৭ এবং জানুয়ারি ২০০৭-জানুয়ারি ২০০৯)

১.৯ সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার উন্মোচন, সংকট উত্তরণ এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. উন্নয়ন ও অগ্রগতির মহাসড়কে বাংলাদেশ

২.১ সামষ্টিক অর্থনীতি, আয় ও বিনিয়োগ

২.২ দারিদ্র্য বিমোচন

২.৩ কৃষি

২.৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

২.৫ শিক্ষা

২.৬ স্বাস্থ্য

২.৭ বিদ্যুৎ

২.৮ যোগাযোগ

২.৯ বন্দর ও নৌপথ

২.১০ শিল্প উন্নয়ন

২.১১ ডিজিটাল বাংলাদেশ

২.১২ আইনের শাসন

২.১৩ পরিবেশ

২.১৪ নারী ও শিশু

২.১৫ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী

২.১৬ ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী
২.১৭ মুক্তিযোদ্ধা
২.১৮ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি
২.১৯ প্রতিরক্ষা
২.২০ পররাষ্ট্র
২.২১ দেশরত্ন শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ
২.২২ উন্নয়ন, গণতন্ত্র, শান্তি ও সমতা প্রতিষ্ঠায় জননেত্রী শেখ হাসিনার সম্মোহনী নেতৃত্বের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি

তৃতীয় অধ্যায়

৩. ঘোষণা ও কর্মসূচি
৩.১ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি
৩.২ জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ
৩.৩ আইনের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা
৩.৪ আওয়ামী লীগের উন্নয়ন দর্শন

চতুর্থ অধ্যায়

৪. উন্নয়ন-সুশাসনের লক্ষ্য ও কর্মসূচি
৪.১ দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধান
৪.২ কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও পল্লি উন্নয়ন
৪.৩ 'আমার গ্রাম – আমার শহর' : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ
৪.৪ শিক্ষা
৪.৫ স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ
৪.৬ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি
৪.৭ যোগাযোগ
৪.৮ শিল্প-বাণিজ্য
৪.৯ বৃহৎ প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট) বাস্তবায়ন
৪.১০ বেসরকারি খাত ও বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ
৪.১১ বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং আইসিটি
৪.১২ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা
৪.১৩ সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
৪.১৪ গণতন্ত্র ও কার্যকর সংসদ এবং গণমুখী দক্ষ জনপ্রশাসন
৪.১৫ জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ ও পানিসম্পদ

৪.১৬ নারীর ক্ষমতায়ন-লিঙ্গ সমতা, আয়বৈষম্য ও সামাজিক সুরক্ষা
৪.১৭ শিশু-কিশোর কল্যাণ
৪.১৮ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চল
৪.১৯ তরুণ যুবসমাজ : 'তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'
৪.২০ শ্রমনীতি
৪.২১ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া
৪.২২ মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা
৪.২৩ সরকার ও এনজিও
৪.২৪ স্থানীয় সরকার
৪.২৫ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ
৪.২৬ প্রতিরক্ষা
৪.২৭ পররাষ্ট্রনীতি
৪.২৮ রোহিঙ্গা সংকট
৪.২৯ ব্লু-ইকোনমি তথা সমুদ্রসম্পদভিত্তিক উন্নয়ন
৪.৩০ এমডিজি অর্জন এবং এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন) বাস্তবায়ন কৌশল (২০১৬-৩০)
৪.৩১ ব-দ্বীপ বা ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০

৫. মুজিববর্ষ পালনে আমাদের অঙ্গীকার

৬. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঘোষণাপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

১.১ ভূমিকা

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐক্যের রূপকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতির স্বতন্ত্র জাতি-রাষ্ট্র ও আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সুমহান ঐতিহ্যের প্রতীক। আওয়ামী লীগ এদেশের বৃহত্তম প্রাচীন রাজনৈতিক দল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পাকিস্তানের প্রথম প্রকৃত বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ আত্মপ্রকাশ করে। জন্মলগ্নে এই দলের নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। দলীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণের মাধ্যমে ১৯৫৫ সালে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' নামকরণ করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় নেতৃত্বে ১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক অবদান।

১.২ আওয়ামী লীগের জন্ম : পটভূমি

সাম্প্রদায়িক ও অবৈজ্ঞানিক দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত দুটি পৃথক ভূ-খণ্ড নিয়ে কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হয়। এই দুই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি এমনকি নৃ-তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও কোনো মিল ছিল না। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত ভূ-স্বামী, ভারত প্রত্যাগত উর্দুভাষী অভিজাত সম্প্রদায় ও উঠতি ধনিক-শ্রেণি এবং সামরিক ও অসামরিক আমলাতন্ত্রের কুক্ষিগত হয়। ঐতিহাসিকভাবে পাকিস্তানি অভিজাত শাসকগোষ্ঠী ছিল বাংলা, বাঙালি এবং বাংলা ভাষা-বিদ্বেষী। অচিরেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রশ্নে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে অস্বীকৃতি জানিয়ে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছাত্র-সমাজ, সংস্কৃতিসেবী, বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তীব্র ক্ষোভ। এই পটভূমিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ৪ মাস ২০ দিন পর ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব বাংলায় প্রথম সরকারবিরোধী ছাত্র-সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' আত্মপ্রকাশ করে। তেজোদ্দীপ্ত তরুণ সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেরণায় এই ছাত্র-সংগঠনটি পরবর্তীকালে বাঙালির

জাতীয় আন্দোলনের মূলধারার অগ্রসর ঝটিকা বাহিনী হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। মুসলিম লীগের দুঃশাসন ও প্রচণ্ড দমননীতির মুখে এক প্রবল বৈরী পরিবেশে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার কে এম দাস লেনের 'রোজ গার্ডেনে' এক কর্মী-সম্মেলনের ভেতর দিয়ে আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করে আওয়ামী লীগ। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতি, টাঙ্গাইলের শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং জেলে বন্দী অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান দলটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। অচিরেই আওয়ামী লীগ হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী সুসংগঠিত প্রধান রাজনৈতিক শক্তি।

১.৩ ভাষা সংগ্রাম থেকে মুক্তিযুদ্ধ

১৯৪৮ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সূচিত ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে গণজাগরণে পরিণত হয়। অব্যাহত রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার তরুণ সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান সেই সময়ে কারান্তরালে থেকেও ভাষা আন্দোলনে পালন করেন প্রেরণাদাতার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। সবচেয়ে সংগঠিত প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এদেশের সকল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং বীর শহিদানের আত্মদানের ভেতর দিয়ে ভাষা আন্দোলন যৌক্তিক বিজয় অর্জন করে।

ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে বাঙালির জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও জাতিসত্তার আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার পথ রচিত হয়। রোপিত হয় বাঙালির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রচিন্তার বীজ। সূচিত হয় গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অকুতোভয় অভিযাত্রা। ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের পটভূমিতে ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তানের স্রষ্টা মুসলিম লীগের হয় শোচনীয় পরাজয়। তিন জাতীয় নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং ২১-দফার পক্ষে বাংলার মানুষের ঐতিহাসিক রায়– গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে নতুন পর্যায়ে উন্নীত করে। এই বিজয়ের পেছনে আওয়ামী লীগ ছিল মূল চালিকাশক্তি। কুটিল প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও বিভেদ সত্ত্বেও পূর্ব বাংলায় দুই বছরের (৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে ৭ অক্টোবর ১৯৫৮) আওয়ামী লীগ শাসন এবং কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশনের এক বছরের (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ থেকে ১৮ অক্টোবর ১৯৫৭ পর্যন্ত) শাসন সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করে অসাম্প্রদায়িক যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন ও পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে গণপরিষদে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পালন করে উদ্যোগী ভূমিকা।

পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার নিশ্চিত করেছিল এক মুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ। আওয়ামী লীগের উদ্যোগেই মাতৃভাষা বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষার আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঘোষিত হয় জাতীয় ছুটির দিন– 'শহিদ দিবস'। আওয়ামী

লীগ সরকারের উদ্যোগেই কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের নির্মাণকাজ প্রায় সম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে জনগণের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তৃণমূল পর্যায়ে দলীয় সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্থাপিত হয় অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত।

দুই দশকের বঞ্চনা এবং ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ১৯৬৫ সালে সংঘটিত পাক-ভারত যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তি সনদ ৬-দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। বিদ্যুৎস্পর্শের মতো এই দাবি সমগ্র বাঙালি জাতিকে সহসা সচকিত করে তোলে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দ্রুতবেগে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাংলাদেশে। স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবিতে সৃষ্টি হয় অভূতপূর্ব জাতীয় জাগরণ। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। তারা ১৯৬৬ সালের ৮ মে মধ্যরাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে গ্রেফতার করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীসহ দেশব্যাপী বিপুল সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে। অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি দেয় সামরিক একনায়ক আইউব খান। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬-দফা দাবিতে আওয়ামী লীগ আহূত হরতালে ঢাকার রাজপথ শ্রমিক-জনতার রক্তে রঞ্জিত হয়। বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য তার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে বন্দী করে রাখে। ছাত্র-সমাজের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালে ৬-দফাভিত্তিক ১১-দফা আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। প্রত্যাহৃত হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন শেখ মুজিব। শেখ মুজিব ভূষিত হন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে। পতন ঘটে আইউব স্বৈরাচারের।

জেনারেল ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে নতুন সামরিক জান্তা সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এক লোক এক ভোট-এর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। ১৯৭০-এর এই ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে পূর্ব বাংলার ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৭টি আসনে অর্থাৎ মোট ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলার জনগণের নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট লাভ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবির্ভূত হন বাংলার গণমানুষের অবিসংবাদিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে।

নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র। বাঙালিদের কাছে তথা আওয়ামী

লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার লক্ষ্য থেকেই ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ফলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলার মানুষ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাখ কোটি বাঙালি স্বাধীনতার দাবিতে সমুদ্র গর্জনে রাজপথে নেমে আসে। স্বাধিকার আন্দোলন রূপান্তরিত হয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে শুরু হয় সর্বাত্মক শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন। সামরিক জান্তার সান্ধ্য আইন, গোলাগুলি ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে বাংলার মানুষ বৈপ্লবিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অচল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে পাকিস্তানি শাসন। প্রশাসন ও জনগণ চলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। আওয়ামী লীগ হয়ে ওঠে বিকল্প সরকার।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার সেই জগৎ বিখ্যাত ভাষণে তিনি বলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' একই ভাষণে তিনি স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে চূড়ান্ত সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে জাতিকে দেন ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। সামগ্রিক সশস্ত্র প্রতিরোধের পাশাপাশি দেশবাসীকে তিনি সম্ভাব্য গেরিলাযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, '... প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু,– আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।'

২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে পাকহানাদার বাহিনী বাংলার মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঘোষণাটি পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকার ইপিআর (বর্তমান বিজিবি) হেড কোয়ার্টার থেকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে প্রেরণ করা হয়। ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা-কিছু আছে, তাই নিয়ে (পাকিস্তানি) সেনাবাহিনীর দখলদারির মোকাবিলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।' চট্টগ্রাম বেতার থেকে ঘোষণা দেওয়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে পৌঁছানো হয়। স্থানীয়ভাবে মাইকিং করে, লিফলেট ছাপিয়ে, যে যেভাবে পেরেছেন সে সেভাবেই জনগণের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেন। বঙ্গবন্ধু দেশবাসীকে আগে থেকেই জনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার ভেতর দিয়ে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ।

১০ এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেন। একই সঙ্গে তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে গঠন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর বলে খ্যাত মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা আম্রকাননে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে। অতঃপর আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত ৯ মাসের বীরোচিত মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে ত্রিশ লাখ শহিদের রক্ত এবং তিন লক্ষাধিক মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশ হানাদারমুক্ত হয়। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। অবসান হয় ২৩ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। শুরু হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের দুরূহ সংগ্রাম।

১.৪ মুক্তিযুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন

৯ মাসের যুদ্ধে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তার দোসররা বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। রেলপথ, সড়কপথ, ব্রিজ, কালভার্ট, সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দরসহ সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামো হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত নয়তো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। পাকহানাদার বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডবের ফলে ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় উৎপাদন বন্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য অচল, হাট-বাজার ভস্মীভূত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ, ঘরবাড়ি নগর-জনপদ হয়ে পড়ে বিধ্বস্ত। ১ কোটি মানুষ দেশান্তরী-উদ্বাস্তু আর তার সঙ্গে আরও ৩ কোটি মানুষ দেশের ভেতরেই ভিটেমাটি ছেড়ে ছিন্নমূল হয়ে পলাতক জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার শূন্য। সম্পদ বিনষ্ট, নিজস্ব কারেন্সি নেই। পাকিস্তানিরা ব্যাংক লুট ও ভস্মীভূত করায় নগদ অর্থ নেই, নেই কোনো উপযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো, দক্ষ লোকবল।

বস্তুত, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে শূন্য হাতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারকে দেশ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। বঙ্গবন্ধুর ক্যারিসমেটিক নেতৃত্ব এবং বিজয়ী জনগণের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আত্মত্যাগের মনোভাবের কারণে স্বল্পতম সময়ে বাংলাদেশ যুদ্ধের ক্ষত মুছে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার ও জাতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলে দ্রুততার সঙ্গে দেশ পুনর্গঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, কল-কারখানা ও

ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন শুরু, ১ কোটি উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন, পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত ৩ কোটি ছিন্নমূল অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু মানুষের জীবনে স্থিতিশীলতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু এবং জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনা হয়। বিস্ময়কর সাফল্য অর্জিত হয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধুর মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনায়কোচিত ব্যক্তিত্বের কারণেই মাত্র তিন মাসের মাথায় ১২ মার্চ ভারতীয় মিত্রবাহিনী স্বদেশে ফিরে যায়। তিনি বাংলাদেশের নিজস্ব সেনা, নৌ, বিমান বাহিনী এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) দ্রুত সংগঠিত করে দেশের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করেন। সুসংগঠিত করেন পুলিশ, আনসার প্রভৃতি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে বাংলাদেশ বিশ্বের অধিকাংশ দেশের স্বীকৃতি অর্জন করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), আংটাড (UNCTAD), কমনওয়েলথ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং ওআইসি-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

অন্যদিকে মাত্র ৯ মাসের মাথায় ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ একটি সংবিধান উপহার দেয়। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সংবিধানের ভিত্তিতে ১৯৭৩ সালের ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অবাধ নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০টির মধ্যে ২৯৩টি আসনে জয়ী হয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের হিরণ্ময় অভিজ্ঞতা, যা বাংলাভাষার ভিত্তিতে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বঞ্চনামুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অনির্বাণ অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। এর প্রথম এবং সার্থক রূপকল্প বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই। সদ্য স্বাধীন দেশের ব্যাপক পুনর্গঠন কাজে তিনি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের প্রতি প্রথম থেকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র এক বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদদের নিয়ে প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে সংগত কারণেই গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। স্বাভাবিক কারণেই প্রথম পরিকল্পনায় পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রাধান্য পায়– কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, বাণিজ্য সর্বত্র। মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার, বীজ, সেচযন্ত্র ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। দেশের বহু অঞ্চলে কৃষকরা এখনও 'শেখ সাহেবের দেওয়া নলকূপ' কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে। ১৯৭৪-এর বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও সেই সঙ্গে পেট্রলের দাম বৃদ্ধি নতুন বিপর্যয় ডেকে আনে। বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কাজে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী, কৃষক-শ্রমিক, এনজিও, বেসরকারি খাত– সবাইকে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

স্বাধীনতার সুফল যাতে সবার কাছে পৌঁছে সেজন্য উন্নয়ন কাজে সবার অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর ফলে, দ্রুত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে তখন বিরাজমান বিশাল খাদ্য ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

মাত্র সাড়ে তিন বছরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ধ্বংসস্তূপ থেকে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পন্ন হয়; উন্মোচিত হয় সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। পরাজিত দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র, অন্তর্ঘাত, বন্যা, খরা ও কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধুর জাদুকরি নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে এক উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় ঐক্যের প্লাটফরম হিসেবে কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ গড়ে তোলেন। বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। খুলে যায় সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। ঠিক সেই মুহূর্তে স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা মরণ আঘাত হানে। দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতির ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাসভবনে সপরিবারে নিহত হন। এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের শিকার হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মহীয়সী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, ভ্রাতা শেখ আবু নাসের, পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামাল এবং তাদের সদ্যপরিণীতা বধূ যথাক্রমে সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল। এমনকি বঙ্গবন্ধুর মাত্র ১০ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেলকেও হত্যা করতে দ্বিধা করেনি নিষ্ঠুর ঘাতকরা। বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে এসে নিহত হন অকুতোভয় দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জামিলসহ কর্তব্যরত পুলিশ বাহিনীর আরও কয়েকজন নিরাপত্তাকর্মী। একই সময়ে নিজ বাসভবনে সপরিবারে নিহত হন কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শেখ ফজলুল হক মনি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজুমনি, ১৩ বছরের কন্যা বেবী সেরনিয়াবাত, ১০ বছরের পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, চার বছরের নাতী সুকান্ত সেরনিয়াবাত, ভ্রাতুষ্পুত্র শহীদ সেরনিয়াবাত ও রিন্টুসহ আত্মীয়-স্বজন। খুনিচক্র এখানেই থেমে থাকেনি। একই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকেও রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হয়। এভাবেই বাংলাদেশের ইতিহাস কালো চাদরে ঢাকা পড়ে যায়। আবারও জাতির বুকে চেপে বসে সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের জগদ্দল পাথর। কায়েম হয় অন্ধকারের রাজত্ব। শুরু হয় হত্যা, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি।

১.৫ স্বৈরশাসন ও প্রতিক্রিয়ার ধারা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর বাংলাদেশ জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসনের জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়। খুনি মোশতাকের অপসারণের পর অস্ত্র হাতে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সংবিধান স্থগিত ঘোষণা ও পার্লামেন্ট বাতিল করে জারি করেন নিরঙ্কুশ সামরিক

শাসন। নিজের ক্ষমতা নিষ্কণ্টক ও সংহত করতে জেনারেল জিয়া বিমান বাহিনীর ৫৬৫ জন অফিসার ও সেনাবাহিনীর প্রায় দুই সহস্রাধিক অফিসার ও সৈনিককে হত্যা করেন। আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার, নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। জিয়াউর রহমান একপর্যায়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন। নিজের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করেন সমগ্র প্রতিরক্ষা বাহিনীকে। তিনি সেনাবাহিনী প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত থেকেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। গণভোট ও নির্বাচনের নামে প্রহসন অনুষ্ঠান, কারচুপি এবং সেনাবাহিনী ও সিভিল প্রশাসনকে পূর্ব নির্ধারিত নীলনকশা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার কাজে ব্যবহারের ধারার সূত্রপাত করেন। পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদ জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

এই সামরিক শাসকরা যথারীতি মৌলিক অধিকার হরণ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে। সামরিক ফরমান বলে সংবিধানকে যথেচ্ছভাবে সংশোধন করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পাল্টে দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হয় নির্বাসিত। স্বাধীনতা-বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পুনর্বাসিত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ ও 'জয় বাংলা' রণধ্বনি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ভেঙে পড়ে আইনের শাসন। হত্যা-ক্যু-পাল্টা ক্যু হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতা বদলের ধারা। সৃষ্টি করা হয় আতঙ্কের পরিবেশ।

জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা দখল, সামরিক শাসন ও সংবিধান সংশোধনীকে ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি এটিএম ফজলে কবিরকে নিয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন অবৈধ ঘোষণা করেছে। ফলে জাতির কলঙ্ক মোচনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত প্রায় আট বছর রাতের বেলা কারফিউ জারি রেখে খর্ব করা হয় মানুষের চলাফেরার স্বাধীনতা। বেসামরিক পোশাকে স্বৈরশাসনকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সেনা ছাউনিতে গঠন করা হয় রাজনৈতিক দল। জনগণের ভোটাধিকার ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করা হয়। স্বৈরশাসকদের মদতে কালো টাকা ও পেশিশক্তির দৌরাত্ম্য রাজনীতিতে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথেচ্ছ লুটপাট, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের ভেতর দিয়ে রাতারাতি গড়ে ওঠে লুটেরা ধনিক ও পরজীবী এলিট-শ্রেণি। পক্ষান্তরে সমাজে প্রকট হয়ে ওঠে ধন-বৈষম্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক সাহায্যনির্ভরতা স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মুখ থুবড়ে পড়ে স্বাধীনতার অঙ্গীকার। অন্যদিকে এসবের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে জনগণের বিরোচিত গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। অবশেষে নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে সামরিক স্বৈরশাসনের অবসান হয়; ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য হন জেনারেল এরশাদ।

তিন জোটের রূপরেখার ভিত্তিতে গঠিত হয় একটি সর্বসম্মত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন। আওয়ামী লীগ যাতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসতে না পারে, সে-লক্ষ্যে চলতে থাকে গোপন ষড়যন্ত্র। জামাতের সঙ্গে গড়ে ওঠে বিএনপির গোপন আঁতাত। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে কোনো দলই সরকার গঠন করার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। ষড়যন্ত্র ও আঁতাতের অংশ হিসেবে জামাতের সমর্থনে ১৯৯১-এর মার্চে বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হয়। তিন জোটের রূপরেখার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে খালেদা জিয়া সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনে গড়িমসি শুরু করে। আওয়ামী লীগের চাপে শেষ পর্যন্ত এই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু হয়; কিন্তু এ-সত্ত্বেও দেশ পরিচালিত হতে থাকে পুরাতন স্বৈরশাসনের ধারায়। আবারও জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় বিএনপি সরকার। জনগণের ওপর নেমে আসে তীব্র রাজনৈতিক নিপীড়ন ও দমননীতি।

আওয়ামী লীগ অতীতের মতোই চরম নির্যাতন-নিপীড়ন উপেক্ষা করে নব্য সামরিক-স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সংগ্রাম গড়ে তোলে। ১৯৮১ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সঞ্চারিত হয় নতুন গতিবেগ। এজন্য তাকে কারাবরণসহ বেশ কয়েকবার জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়। দেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং 'ভোট ও ভাতের' অধিকার প্রতিষ্ঠায় শেখ হাসিনা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করেন। জনগণ যাতে নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে-লক্ষ্যে তিনি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু খালেদা জিয়া তা উপেক্ষা করে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের ভোটারবিহীন প্রহসনমূলক একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলার মানুষ গর্জে ওঠে। অপ্রতিরোধ্য গণ-অভ্যুত্থানের মুখে খালেদা ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ১২ জুন অনুষ্ঠিত অবাধ নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচনে বিজয় লাভ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। অবসান হয় ২১ বছরের দুঃসহ স্বৈরশাসন।

১.৬ গৌরবোজ্জ্বল পাঁচ বছর : স্বাধীনতার সুবর্ণ সময়

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা দিবসে শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেন। দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় পুনঃপ্রত্যাবর্তনের ফলে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সূচিত স্বৈরশাসন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ধারার অবসান হয়। শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করা, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে মন্ত্রীর বদলে সংসদ সদস্যদের চেয়ারম্যান করা এবং প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি প্রশ্নোত্তর প্রথা চালু প্রভৃতির ভেতর দিয়ে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়। ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও সেখানে দুই যুগের ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি-রক্তপাত বন্ধ হয়। আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল এবং জাতির জনকের হত্যার বিচার প্রভৃতির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে।

মাত্র পাঁচ বছরে উন্নয়ন-অর্থনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জিত হয় চমকপ্রদ সাফল্য। এই প্রথম দেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে। মুদ্রাস্ফীতির হার নেমে আসে ১.৫৯ শতাংশে অথচ পাঁচ বছরে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে গড়ে প্রায় ৬ শতাংশ হারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি। জনগণের মাথাপিছু আয় ২৮০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৩৮৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। মানব দারিদ্র্যসূচক ১৯৯৫-৯৬ সালের ৪১.৬ শতাংশ থেকে ২০০১ সালে ৩৪ শতাংশে নেমে আসে। একই সময়ে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৫৮.৭ বছর থেকে ৬২ বছরে উন্নীত হয়। সাক্ষরতার হার পূর্বতন বিএনপি আমলের ৪৪ শতাংশ থেকে বেড়ে আওয়ামী লীগ আমলে ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি করা হয়। স্থাপিত হয় নতুন নতুন শিল্প-কারখানা ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা। বেড়ে যায় বৈদেশিক বিনিয়োগ। একটি শিল্প সভ্যতার ভিত্তি রচনার শুভ সূচনা হয়।

দারিদ্র্য বিমোচনে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম 'বয়স্ক ভাতা', 'বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা', 'অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা', 'আশ্রয়ণ প্রকল্প', 'গৃহায়ন', 'আদর্শ গ্রাম', 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'কর্মসংস্থান ব্যাংক'সহ আত্মকর্মসংস্থানমূলক বহুমুখী সৃজনশীল প্রকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অতীতের শাসকদের লুটপাট, দুর্নীতি ও অস্থিতিশীলতা এবং এডহক-ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার ধারা পরিহার করে শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি, কৃষিনীতি, স্বাস্থ্যনীতি ও জ্বালানিনীতির মতো প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি অর্জন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গৌরব। আওয়ামী লীগ আমলেই ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট ও ওয়ানডে ক্রিকেটে খেলার মর্যাদা লাভ করে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ, বাংলাদেশের ডি-৮ গ্রুপের নেতা নির্বাচিত হওয়া, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইউনেস্কো হুপে বোওয়ানি শান্তি পুরস্কার ও FAO-এর 'সেরেস' পদক লাভ প্রভৃতির ভেতর দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ লাভ করে এক মর্যাদার আসন। বিশ্বসভায় গড়ে ওঠে

বাঙালি জাতির এক নতুন ইমেজ। সেকুলার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের অমিত সম্ভাবনাময় নতুন পরিচয়। আওয়ামী লীগের এই পাঁচ বছরের শাসনামল জাতীয় ইতিহাসের সুবর্ণ সময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সেবারই প্রথম একটি নির্বাচিত সরকার তার পাঁচ বছরের পূর্ণ মেয়াদ শেষে শান্তিপূর্ণভাবে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই ক্ষমতা হস্তান্তর করে।

১.৭ বিএনপি-জামাত জোট সরকারের দুর্নীতি, দুঃশাসন ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ

বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক' সরকারের অধীনে ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দায়িত্ব গ্রহণের পরমুহূর্ত থেকেই এই সরকার পূর্ব পরিকল্পনামতো এমন সব পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকাণ্ড চালায়, যার ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার নিরপেক্ষতা হারায়। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হত্যা ও নির্যাতন করে, মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার, লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করা শুরু হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বিএনপি-জামাত জোটের যোগসাজশে অভূতপূর্ব কারচুপির মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অনিবার্য বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হয়। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ছত্রছায়ায় দমন-পীড়ন, সন্ত্রাস, রক্তপাত ও ভোট কারচুপির ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বিএনপি-জামাত জোট।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশের সামনে যে অমিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, বিএনপি-জামাত জোটের পাঁচ বছরে দুঃশাসনের ফলে সেই সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে। দেশ পরিণত হয় মৃত্যু উপত্যকায়। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট খালেদা জিয়া সরকারের মদতে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার লক্ষ্যে গ্রেনেড হামলায় কেন্দ্রীয় নেত্রী আইভি রহমানসহ ২২ জন নিহত হন এবং গুরুতর আহত হন ৫ শতাধিকেরও বেশি নেতাকর্মী। অনেকেই চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যান। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য ও নির্মূল করার সুপরিকল্পিত নীলনকশার অংশ হিসেবেই প্রতিহিংসাপরায়ণ বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই একের পর এক সশস্ত্র আক্রমণ-অভিযান পরিচালনা করে। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা ছিল সেই নৃশংস বর্বরতার চরম প্রকাশ। এই একই লক্ষ্যে সাবেক অর্থমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়া, শ্রমিক নেতা ও সংসদ সদস্য আহসানউল্লাহ মাস্টার, অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম ও মমতাজ উদ্দিনসহ আওয়ামী লীগের ২১ হাজার নেতাকর্মীকে বিএনপি-জামাত জোট ও তাদের সহযোগী সন্ত্রাসীরা হত্যা করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ লাখ লাখ আওয়ামী লীগ সমর্থক রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাজার হাজার নারী

ও নারীশিশু হয় ধর্ষণ, গণধর্ষণের শিকার। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী– কেউই বিএনপি-জামাতের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। জনগণের জীবন হয়ে পড়ে নিরাপত্তাহীন। সরকারি মদতে উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান, গ্রেনেড হামলা, বোমাবাজি এবং একের পর এক হত্যাকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশ পরিণত হয় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নতুন অভিমুখ। পক্ষান্তরে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। আইনের শাসন ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা হয় অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে।

বিএনপি-জামাত জোটের পাঁচ বছরে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। জোট সরকার ও হাওয়া ভবনের পৃষ্ঠপোষকতায় খাদ্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ আমলের তুলনায় দ্রব্যমূল্য ১০০-২০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতির হার আওয়ামী লীগ আমলে ১.৫৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। পক্ষান্তরে গড় প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯২ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৫.১ শতাংশে। পাঁচ বছরে জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি বাড়লেও খাদ্য উৎপাদন আওয়ামী লীগ আমলের ২ কোটি ৬৮ লাখ টন থেকে কমে দাঁড়ায় ২ কোটি ৬১ লাখ টন। দারিদ্র্য হ্রাসের হার কমে আবার ০.৫০ শতাংশে নেমে আসে। দরিদ্র মানুষের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। বিএনপি-জামাত জোটের পাঁচ বছর ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরসহ মোট সাত বছরে নতুন করে দরিদ্র হয় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ। বাড়ে ধন-বৈষম্য। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

বিএনপি-জামাত জোট দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় এলেও, দুর্নীতি-লুটপাট ও দুর্বৃত্তায়নই এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অতি নিকটজনের নেতৃত্বে ১১১ জন গডফাদারের দৌরাত্ম্য হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। 'হাওয়া ভবন'কে রাষ্ট্রক্ষমতার সমান্তরাল কেন্দ্রে পরিণত করা হয় এবং এটি হয় দেশের সমুদয় দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদের প্রসূতি কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান কালো টাকার অধিকারী হয়ে পড়েন এবং প্রধানমন্ত্রীর ছেলেরা বিদেশে অর্থ পাচারের সঙ্গে যুক্ত হন। বিএনপি-জামাত জোটের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, নেতাকর্মী এবং দলীয় প্রশাসনের অকল্পনীয় দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, লুটপাট, চাঁদাবাজি প্রভৃতির ফলে টিআইবি পরপর পাঁচবার বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে।

সর্বক্ষেত্রে সরকারের দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার ফলে উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট হয়ে ওঠে অসহনীয়। পাঁচ বছরে জোট সরকার ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারেনি। বিদ্যুৎ খাতে লুটপাট ও অপব্যয় হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের কারণে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে সৃষ্টি হয় চরম

সংকট। বিদ্যুতের দাবি জানাতে গেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাটে ২০ কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯১-৯৬ পর্যন্ত বিএনপি সরকার সারের দাবি জানানোর অপরাধে একইভাবে ১৮ কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছিল।

বস্তুত জোট সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও নারী উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয় স্থবিরতা। জোট সরকার জনপ্রশাসন, পুলিশ বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, বিচার বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ রাষ্ট্র ও সরকারের সকল অঙ্গপ্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। শত শত উচ্চপদস্থ বেসামরিক, সামরিক ও পুলিশ কর্মকর্তাকে পদচ্যুত, বাধ্যতামূলক অকালীন অবসর প্রদান করার পাশাপাশি দলীয় অনুগত অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়মবহির্ভূত পদোন্নতি প্রদান ও নিয়োগদান করে। দলীয় ক্যাডারদের নিয়োগদানের জন্য কর্মকমিশনের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। দলীয় অনুগত ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির চাকরির বয়সসীমা দুই বছর বৃদ্ধি করা হয়। অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের বিচারপতি নিয়োগ করে সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদা ও মানুষের শেষ ভরসাস্থলটিকে ধ্বংস করা হয়।

বিএনপি-জামাত জোট সংসদকে অকার্যকর এবং সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে। সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলতে না দেওয়া, স্থায়ী কমিটিগুলোর কর্মকাণ্ডকে স্থবির এবং ব্রুট মেজরিটির জোরে গণতন্ত্র চর্চার সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে আজ্ঞাবহ দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। সংবিধান ও সুপ্রিমকোর্টের রায় উপেক্ষা করে ১ কোটি ১৩ লাখ ভুয়া ভোটারসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩ শতাধিক দলীয় ক্যাডারকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করে। জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও কারচুপিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যার ফলে পুরো নির্বাচন ব্যবস্থা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

১.৮ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল : গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও উত্তরণ (অক্টোবর ২০০৬-জানুয়ারি ২০০৭ এবং জানুয়ারি ২০০৭-জানুয়ারি ২০০৯)

পছন্দের লোকের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে গিয়ে তীব্র গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হয় বিএনপি-জামাত জোট সরকার। বিদায়ের মুহূর্তে ২০০৬ সালের অক্টোবরে সারাদেশে আওয়ামী লীগের ৬৮ জন নেতাকর্মীকে হত্যা করে জোট সরকার। বিএনপি-জামাত জোট পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য তাদের নীলনকশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধান লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিনকে প্রধান উপদেষ্টা বানিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে। বিএনপির দলীয় ব্যক্তি ড. ইয়াজউদ্দিনের পুতুল তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপি-জামাত জোটের নির্দেশ মানতে গিয়ে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ করে। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য

নীলনকশার নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করার ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট। সাধারণ জনগণ রাস্তায় নেমে আসে– গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। জামাতের সশস্ত্র ক্যাডার ও বিএনপির সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে রাজপথে অস্ত্র ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে– 'মরলে শহিদ বাঁচলে গাজী'– এই স্লোগান দিয়ে মানুষ হত্যা শুরু করে– দেশে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বিএনপি-জামাত জোট ও তাদের আজ্ঞাবহ রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বঘোষিত প্রধান উপদেষ্টা ড. ইয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সরকারের কর্মকাণ্ডের ফলেই ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তন সংঘটিত হয়। ড. ইয়াজউদ্দিন প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে অপসারিত হন। অবসান হয় পুতুল নাচের ইতিকথা। সেনাবাহিনীর সমর্থনে ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে নতুন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। দেশে জরুরি অবস্থা জারি ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ থাকে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নানা সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, ভুল-ত্রুটি ও সফলতা নিয়ে প্রায় দুই বছর ক্ষমতাসীন ছিল। সরকারের সফল কাজ হলো ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী এ কাজটি সম্পন্ন করায় প্রশংসিত হয়। সরকার নির্বাচনী আইন এবং প্রক্রিয়ারও উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর একটি অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য এই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৩৩টি আসন, অন্যান্য অংশীদার দলসহ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৬৩টি আসন লাভ করে। কিন্তু এই বিজয় খুব সহজসাধ্য ছিল না। ১/১১-এর পরিবর্তন যেমন বিদ্যমান সংকট মোচনের পথ উন্মুক্ত করে, তেমনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ছত্রছায়ায় মহলবিশেষের বাড়াবাড়ি, জবরদস্তি, অরাজনীতিকায়নের প্রচেষ্টা এবং 'মাইনাস টু' ফর্মুলা বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতকেই অনিশ্চিত করে তোলে। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান সমাজে একটা বড় রকমের ঝাঁকুনি দিলেও প্রকৃত অপরাধীদের সমান্তরাল জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ বহুসংখ্যক নিরপরাধ আওয়ামী লীগ নেতা ও ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার-নির্যাতন পুরো অভিযানটিকেই প্রায় অর্থহীন করে তোলে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও মহলবিশেষের এসব অবিমৃশ্যকারী পদক্ষেপ, ষড়যন্ত্র এবং বিশেষ করে বিএনপি-জামাত জোট, খালেদা জিয়া ও তার পরিবারের অপরাধসমূহকে আড়াল করতে গিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার জীবন বিপন্ন করার অপচেষ্টা, তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে নিষেধাজ্ঞা এবং গ্রেফতার-নির্যাতন পুরো দৃশ্যপটকে বদলে দেয়। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশ-বিদেশে নিন্দার ঝড় ওঠে। প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এই ষড়যন্ত্র-অপচেষ্টার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে তীব্র জনমত। জননেত্রী শেখ হাসিনার অনমনীয় আপসহীন সাহসী ভূমিকার ফলে কার্যত মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে, তার প্রিয় স্বদেশবাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

আওয়ামী লীগ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনগণকে সাথে নিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এসব দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য কঠিন সংগ্রাম করে দলটি একটি ঐতিহাসিক জাতীয় দায়িত্ব পালন করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। দেশের সকল দলের অংশগ্রহণে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশে গণতন্ত্রে উত্তরণ ও দিনবদলের শুভ সূচনা হয়।

১.৯ সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার উন্মোচন, সংকট উত্তরণ এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রায় ৯০ শতাংশ আসনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। এই ফলাফল ছিল বিএনপি-জামাত সরকারের ব্যর্থতা, সীমাহীন দুর্নীতি, লুটপাট, দুঃশাসন ও অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম এবং নির্বাচনী ইশতেহার 'দিনবদলের সনদের' অঙ্গীকারের পক্ষে জনগণের ঐতিহাসিক গণরায়। বিএনপি-জামাত ঐক্যজোট সরকার ও সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চরম অব্যবস্থাপনা থেকে সৃষ্ট গভীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে এ বিজয় বাঙালি জাতির জন্য সম্ভাবনার এক স্বর্ণদুয়ার উন্মোচন করে। ২০২০ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে এই দিনবদলের সনদ তথা নির্বাচনী ইশতেহার কেবল পাঁচ বছরের নয়, আগামী ২০২১ সালে আমরা কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই তার একটি রূপকল্প তুলে ধরা হয়।

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সকল একাগ্রতা, বিচক্ষণতা ও লক্ষ্যে পৌঁছার স্থির সংকল্প নিয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ গ্রহণ করা হয় এবং তা বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হিসেবে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১০-১৫ গ্রহণ করা হয়। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে মহাসড়ক ও উড়াল পথ নির্মাণসহ ঢাকায় মেট্রোরেল চালু করার মতো যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ও বাজেট ঘাটতি হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে সর্বোচ্চ রেকর্ড, ঋণ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নসহ সামষ্টিক অর্থনীতিতে এক নজিরবিহীন ইতিবাচক পরিবর্তন অর্জিত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও

বিতরণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও জেন্ডার সমতা, ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার, পরিবেশ বিপর্যয়রোধ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে শুরু হয় নতুন কর্মযজ্ঞ। এসব অর্জনের ভিত্তিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর বছর ২০২০ সালে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়। বিশ্বে বাংলাদেশ হয়ে ওঠে 'উন্নয়নের এক বিস্ময়' বা মিরাক্যাল অর্থনীতির দেশ। দুঃখজনকভাবে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনেমারা স্বাধীনতার পরপরই মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশকে বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই চলতে হয়। অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র এবং মাথাপিছু আয় ৬০-৭০ মার্কিন ডলার। জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশকে ক্রমেই অস্তিত্বের সংকটে ঠেলে দেবে।' পরম আনন্দের কথা বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন উড়ন্ত সূচনার পর্যায়ে রয়েছে। বিনিয়োগ বাড়ছে, যা জিডিপি'র ৩১.১৩ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধি তরতর করে বাড়ছে, যা ৮.১৫ শতাংশ। কৌশিক বসুর মন্তব্য আজকের বাংলাদেশ পুরোটাই সাফল্যের গল্প, বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে অতীতের সকল নেতিবাচক উক্তি ও আশঙ্কাকে ভুল ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব দরবারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য ছিল ঈর্ষণীয়। দারিদ্র্যমোচনসহ সামাজিক খাতে অসাধারণ অগ্রগতি সারাবিশ্বে বিপুলভাবে নন্দিত হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সাফল্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। উপমহাদেশের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন তার– 'An Uncertain Glory of India and its Contradiction' বইয়ে লিখেছেন 'অনেক দেশের তুলনায় ভারত অর্থনীতিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, অথচ সামাজিক সূচকের (স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দরিদ্র হ্রাস ইত্যাদি) ক্ষেত্রে বেশ পিছিয়ে, এমন কি বাংলাদেশের চেয়ে মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ হলেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে অনেক কম।'

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে অগ্রসর হয়। লক্ষ্য স্থির করা হয় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত সমৃদ্ধিশালী দেশের সক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি শুরু হয় ইতিহাসের সকল কালিমামোচন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু হত্যার অসমাপ্ত বিচারকাজ সম্পন্ন করা ও আদালতের রায় কার্যকর করা, মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচারকাজ শুরু করা, জাতীয় চার নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন, সাংবিধানিকভাবে অগণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করার মতো উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত এ সময়ে

বাস্তবায়ন করা হয়। দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের সন্তানদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠার মতো যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালনায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

উন্নয়নের এই মহাসড়কে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়া, গণতন্ত্রকে সুরক্ষা করা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালনার পথ কোনোমতেই মসৃণ ছিল না। নির্বাচনে পরাজিত বিএনপি-জামাত গোষ্ঠী গণরায়কে মেনে নিতে পারেনি। তাই প্রতিনিয়ত নানা ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড দ্বারা উন্নয়নের গতিপথ রুদ্ধ করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের অব্যবহিত পরেই বিডিআর বিদ্রোহের আত্মঘাতী ঘটনাকে পুঁজি করে দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা, সংবিধানে সংশোধনে অসহযোগিতার নামে অব্যাহতভাবে সংসদ বর্জন করে হরতাল-অবরোধের মাধ্যমে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপপ্রয়াসসহ বিএনপি-জামাত স্বাধীনতাবিরোধী সকল অপশক্তি একত্রিত হয়ে প্রগতির চাকাকে উল্টে দিতে উদ্যত হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের জন্য দেশি ও আন্তর্জাতিক শক্তি মরিয়া হয়ে ওঠে, দেশে সন্ত্রাস ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে সন্ত্রাস ও সহিংসতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। জামাতের প্রভাব ও প্ররোচনায় বিএনপিও মনে করতে থাকে যে সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদই ক্ষমতার মসনদে যাওয়ার একমাত্র পথ। এসব প্রতিকূলতা প্রতিহত করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সরকার সামাজিক সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয় এবং পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে দেশের অগ্রগতিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে।

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি ও জামাতসহ স্বাধীনতাবিরোধী উগ্র-সাম্প্রদায়িক শক্তির সন্ত্রাসী চরিত্র দেশবাসীর সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নস্যাতের জন্য বিএনপি-জামাতসহ স্বাধীনতাবিরোধী উগ্র-সাম্প্রদায়িক শক্তি জোটবদ্ধ হয়ে হত্যা, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সাধারণ নাগরিকদের হত্যা ও '৭১-এর মতোই যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় জামাত-শিবিরের ঘাতক বাহিনী বিএনপিকে নিয়ে দেশবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হেফাজতে ইসলামকে মাঠে নামিয়ে তাদের অনুসারী ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ঢাকা দখলের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতে হুমকি প্রদর্শন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দিয়ে সরকার পতনের এ ষড়যন্ত্র ও অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে দেশ ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করেন।

নির্বাচনকালীন সরকারের প্রশ্নে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকল প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে তোলার অপচেষ্টা অব্যাহত থাকে। বিএনপি নেত্রীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেলিফোনে সংলাপের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সংলাপের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে

সংঘাত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকার উৎখাতে তিনি মরিয়া হয়ে ওঠেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সর্বদলীয় সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে লাগাতার হরতাল ও অবরোধের মাধ্যমে নির্বাচন বানচালের ঘোষণা দেয়। স্কুল-কলেজে অরাজকতা সৃষ্টি করে, রেললাইন ধ্বংসসহ ট্রাক, বাস ও অন্যান্য যানবাহন ও নির্বাচন কেন্দ্র পুড়িয়ে এবং নির্বাচনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর অত্যাচার, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও হত্যাসহ পৈশাচিক এক তাণ্ডব সৃষ্টি করে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা চালায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করে এবং তাদের গাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে। দেশে অচলাবস্থা সৃষ্টির এই সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করে এবং দল ও জনগণকে সাথে নিয়ে সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা ধ্বংস করে অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতায় যাওয়ার বিএনপি-জামাতের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ করে ৫ জানুয়ারি ২০১৪ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার এ ক্রান্তিকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠায় এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

দেশের অচলাবস্থা সৃষ্টির এই সর্বাত্মক উদ্যোগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করে এবং সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট নতুন করে সরকার গঠন করে এবং ক্রমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। পরিস্থিতি সামাল দিয়ে নতুন উদ্যমে নতুন সরকার উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে। জনগণের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ ফিরে আসে এবং নতুন উদ্দীপনায় জনগণ সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আস্থা স্থাপন শুরু করে। আন্তর্জাতিক মহল নির্বাচনোত্তর প্রাথমিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সরকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ঘোষণা করে। সন্ত্রাস দমনে সরকারের দৃঢ়তা সর্বমহলে যেমন নন্দিত হয়, তেমনি কুচক্রীমহলের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়। তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেশে নতুন করে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিনিয়োগের সুযোগ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এমন এক পরিস্থিতিতে সরকারের দ্বিতীয় বছর জানুয়ারি ২০১৫ থেকে একটানা ৯০ দিন ধরে বিএনপি-জামাত অনির্দিষ্টকালের হরতাল-অবরোধ ঘোষণা করে, যা আক্ষরিক অর্থে আগুন সন্ত্রাসে রূপ নেয়। অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করে ৫ হাজারের অধিক যানবাহন ধ্বংস করে। ১৫০ জন মানুষ পুড়িয়ে মারার মতো নারকীয় তাণ্ডব সৃষ্টি করে। শত শত মানুষকে দগ্ধ করে আহত করা হয়, যারা এখনও দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ভুগছে। অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং শিশুরা এ হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি। পৈশাচিকতা ও বর্বরতার মাত্রা মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও নাশকতাকে হার মানিয়েছে। আওয়ামী লীগ আগুন সন্ত্রাস দৃঢ়হস্তে দমন করে দেশকে স্থিতিশীল করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং সন্ত্রাসীগোষ্ঠী প্রগতিশীল শক্তির কাছে পরাজয়বরণ করে।

উপরোক্ত পরিবেশে দেশ যখন নতুন আস্থা ও প্রত্যয়ে অগ্রসর হয় এবং জনমনে ব্যাপক

উদ্দীপনা দেখা দেয়, ঠিক তখনই উগ্র-ধর্মান্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীর সহযোগিতায় চিহ্নিত একটি মহল দেশে জঙ্গিবাদের উত্থানের ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তারই অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্থানে নিরীহ মানুষ, সংখ্যালঘু ও বিদেশিদের হত্যা করে নতুন এক ভয়ের সংস্কৃতি প্রসারে উদ্যত হয়। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর বিএনপি-জামাত চক্র নির্বিচার অত্যাচারে লিপ্ত হয়। মসজিদের ইমাম, হিন্দু পুরোহিত, খ্রিষ্টান ধর্মযাজকগণকে হত্যা করে এবং বৌদ্ধমন্দির আক্রমণ করে। মুক্তমনা মানুষের ওপর চোরাগুপ্তা হত্যা পরিচালনা করতে থাকে। কিছু কিছু বিদেশি নাগরিককে লক্ষ্য করে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। সর্বশেষে ঢাকায় গুলশানের হলি আর্টিজান ক্যাফে নামক রেস্তোরাঁয় আক্রমণ করে ১৭ বিদেশিসহ ২২ নিরীহ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে। জঘন্যতম এ হতাকাণ্ডে গোটা জাতি স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠে নামাজের সময় জঙ্গি আক্রমণের ঘৃণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু দুজন নিরীহ মানুষ এবং পুলিশ সদস্য এই আক্রমণে নিহত হন। দেশ আত্মঘাতী নতুন এক জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান প্রত্যক্ষ করে।

দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও অব্যাহত অগ্রগতির পথকে ধ্বংস করার অপচেষ্টায় জঙ্গিগোষ্ঠীর এ ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। 'জেগে ওঠো বাংলাদেশ, রুখে দাঁড়াও জঙ্গিবাদ' আওয়ামী লীগের এ স্লোগানে সাড়া দিয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ঘোষণা করে। দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে জঙ্গি দমনে সাফল্য অর্জন করতে থাকে। গুলশানসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি হামলা পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত ও গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। নতুন নতুন হামলার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে জঙ্গি নেটওয়ার্ক অকার্যকর করে তোলে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই মানুষের মধ্যে জঙ্গি দমনে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি ব্যাপক সমর্থন অর্জন করে এবং দেশে স্বস্তির পরিবেশ ফিরে আসতে থাকে। জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় সরকারের দৃঢ়তার প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট জঙ্গি দমনে বাংলাদেশের সাফল্য ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে এবং সরকারের ও দেশের ভাবমূর্তিকে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যায়। এ সাফল্য জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতা ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জঙ্গিবিরোধী নীতি ও কৌশলের সাফল্যের পরিচয় বহন করে। দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে ব্যাপক গণঐক্য। সন্ত্রাস, অবরোধ, জঙ্গিবাদের সকল ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের দল হিসেবে ইতিহাসে নতুন এক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১০ বছর মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার যেমন একদিকে জনগণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, অন্যদিকে সংঘাত, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদের উত্থান মোকাবেলায় সরকারের দৃঢ়তা ও সাফল্য জনমনে নতুন এক আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে। সম্ভাবনার এ স্বর্ণদুয়ার উন্মোচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জননেত্রী শেখ হাসিনা হয়ে ওঠেন দেশের ভবিষ্যতের বিশ্বস্ত কাণ্ডারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উন্নয়ন ও অগ্রগতির মহাসড়কে বাংলাদেশ

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারবদ্ধ। পঁচাত্তরে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সূচিত স্বৈরশাসন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ধারার অবসান ঘটিয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার গঠন করে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অতীতের পুঞ্জিভূত সমস্যা, চরম অব্যবস্থাপনা এবং বিশ্বমন্দার পটভূমিতে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে মহাজোট সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। শুরু হয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পালা। সরকার দক্ষতার সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে যে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে, তা দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন দৃশ্যমান।

২.১ সামষ্টিক অর্থনীতি, আয় ও বিনিয়োগ

বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ গতি ও মন্দার অভিঘাত সত্ত্বেও সন্তোষজনক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.০ হতে ৬.৫ শতাংশের বলয় অতিক্রম করে অনেক প্রত্যাশার সাতোর্ধ্ব ৭.০৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.১৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। এর ফলে মাথাপিছু আয় উন্নীত হয় ১ হাজার ৯০৯ মার্কিন ডলারে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জিডিপি ছিল ৪ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হয়েছে ২২ লাখ ৫০ হাজার ৪৭৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ ২০০৫-০৬ ভিত্তি বছরের প্রায় ৫ গুণ। মাত্র সাত বছরে তা দ্বিগুণ হয়েছে। অথচ ইতোপূর্বে মাথাপিছু জিডিপি দ্বিগুণ হতে ২০ বছর লেগেছে। ক্রয়ক্ষমতার সমতার জিডিপি'র ভিত্তিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ আজ ২৬তম স্থান অধিকার করে আছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার ৫৮ কোটি টাকা, যা বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫ গুণেরও বেশি, অর্থাৎ ৫ লাখ ২৩ লাখ হাজার ১৯০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন বাজেটে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে (২০১৯-২০) ২ লাখ ২ হাজার ৭২১ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল মাত্র ২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। বাজেট ঘাটতি আশানুরূপভাবে জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে রাখা গেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার শুরু থেকে বেসরকারি বিনিয়োগে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রসারের লক্ষ্যে বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন, আইন ও বিধিগত সংস্কার তথা সঠিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ আরও জোরদারের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূত

করা হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মোট ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা অনুমোদিত হয়েছে। ২৪টির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ১২৭টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু করেছে, তন্মধ্যে ২০টি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে। বেসরকারি বিনিয়োগ ২০০৫-০৬-এর ৯৯ হাজার ২৭১ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৭ গুণ। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.০০ শতাংশ, যা অর্থবছর ২০০৫-০৬-এ ছিল ২৫.৮ শতাংশ। সরকারি বিনিয়োগ অর্থবছর ২০০৫-০৬ সালে ৪.১৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭.৬০ শতাংশ।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে রপ্তানি আয় অন্যতম চালিকাশক্তি। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ১০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রায় ৪ গুণ বেড়ে হয়েছে ৪০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশের ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার ফলে উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অধিক গুরুত্ব দেওয়া এবং শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধিতে প্রত্যাশিত শিল্প খাতের অংশীদারিত্ব বাড়বে।

গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের হার যথাক্রমে জিডিপি'র ২৩.৮৯ এবং ৩০.০৮ শতাংশ, যা অর্থবছর ২০০৮-০৯-এ ছিল ২০.৩৯ এবং ২৮.৬৬ শতাংশ। অর্থবছর ২০০৫-০৬-এর তুলনায় ২০১৮-১৯ বছরে মোট রাজস্ব ও কর রাজস্ব ৩ গুণের অধিক হয়েছে। মোট রাজস্ব আয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৪৪.২ হাজার কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ লাখ ৯৬ হাজার ২০১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। মোট রাজস্ব আয় প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থাপনায় নেওয়া বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনি সংস্কার, জনবল বৃদ্ধি, অটোমেশন পদ্ধতি প্রবর্তন ইত্যাদি পদক্ষেপ এই বাড়তি রাজস্ব আহরণে বিশেষ অবদান রাখে।

চলতি অর্থবছরে গড়ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৩৭ শতাংশ, খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৫.১০। জোট সরকার ও পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। মূলত সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদন, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য হ্রাস, সামষ্টিক অর্থনীতির দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক থাকায় মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। আশা করা যায়, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে।

উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে আর্থিক খাতে দক্ষতা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমানত ও ঋণের সুদ এবং সুদের হারের ব্যবধান কিছুটা কমেছে। আমানত ও সুদের হারের ব্যবধান বর্তমানে ৫.০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবাসী আয় এসেছে ১৬.৪ বিলিয়ন ডলার, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৪.৮০ বিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে রিজার্ভ ছিল মাত্র ৩.৪৮ বিলিয়ন ডলার।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মুদ্রাস্ফীতি প্রশমনের পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন স্কেল ও মহার্ঘ ভাতা প্রদান, আয়বর্ধক কর্মসৃজন, ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে মানুষের প্রকৃত আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০০৯-১৮ সময়কালে বেতন ৩৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলের জন্য পরম তৃপ্তির কথা, এই বেতন বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি।

সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ অগ্রগতির স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে এবং ২০১৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক নিম্ন আয়ের দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতির জন্য ৩টি নির্ণায়ক অর্জন করেছে। উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির গতিধারা থেকে আজ এ-কথা সহজেই বলা যায় যে বাংলাদেশ উন্নয়ন, গণতন্ত্র, শান্তি ও সমৃদ্ধির মহাসড়কে। রূপকল্প ২০২১ নির্ধারিত মাথাপিছু আয়ের লক্ষ্য অর্জন এবং বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর হওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার।

২.২ দারিদ্র্য বিমোচন

দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সাফল্য দেশীয় পরিমণ্ডলের বাইরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ব্যাপক দারিদ্র্য একটি জাতির মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে চরম অন্তরায়। এমডিজি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০১৫-এর মধ্যে দারিদ্র্য ২৮.০ শতাংশে নিয়ে আসা। ২০০৬ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৩৮.৫ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ছিল ১৭.৫ শতাংশ, যা ২০১৮-১৯ সালে প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০.৫ শতাংশ এবং অতি দরিদ্র ১০.৩ শতাংশ। আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণকালে ২০০৯ সালে দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৫ কোটি, যার মধ্যে চরম দারিদ্র্যে নিপতিত ছিল প্রায় ২ কোটি ৮৮ লাখ মানুষ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিগত ২২ বছরে মোট জনসংখ্যা যতটুকু দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করেছে, তার ৪৫ শতাংশই অতিক্রম করেছে গত মাত্র পাঁচ বছরে। অর্জিত সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকলে দারিদ্র্য ২০২৩ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ১২.৩ শতাংশে নেমে আসবে এবং অতি দরিদ্র ৫.০ শতাংশে নেমে আসবে।

অঞ্চলভিত্তিক অসমতা কমেছে, কমেছে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান। দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মূলে রয়েছে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি সহায়ক (Inclusive Growth) নীতি ও কৌশল। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার একদিকে ব্যক্তি খাতের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে, অন্যদিকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় নিশ্চিত করা হয়েছে সম্পদের সুষম পুনর্বণ্টন।

সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় ২০১৩ সালের পরিচালিত এক খানা জরিপে দেখা গেছে, দেশের ২৪.৫৭ শতাংশ পরিবার সামাজিক সুবিধা ভোগ করেছে। বিগত পাঁচ বছরে শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, বয়স্ক ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, আমার বাড়ি আমার খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, টিআর, জিআর, দুস্থ মাতাদের জন্য খাদ্য (ভিজিডি), চর জীবিকায়নসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আবাসিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গরিব, বঞ্চিত, অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে বিভাগীয় ও জেলা শহরে আবাসনসহ উপযুক্ত কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা (উত্তরাঞ্চল, উপকূলবর্তী এলাকা ও চরাঞ্চল প্রভৃতি)-সহ সারাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর গড়ে ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে ৮ লাখ মানুষের ৮০ দিনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির ফলে একদিনের মজুরি দিয়ে একজন শ্রমিক প্রায় ১০-১২ কেজি চাল কিনতে পারছে, বাংলাদেশের ইতিহাসে যা সর্বোচ্চ। অথচ ২০০৬-০৭ অর্থবছরে একদিনের মজুরি দিয়ে ক্রয় করা যেত মাত্র ৪ কেজি চাল। চালের মূল্যের সাথে তুলনা করে (Rice Equivalent Wage) দেখা যায়, ১১ বছরে প্রকৃত শ্রমিক মজুরি ৩ গুণের বেশি বেড়েছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার কমে আসার এও অন্যতম কারণ। দেশে মঙ্গা বা আধাদুর্ভিক্ষ শব্দটি এখন আর শোনা যায় না।

দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে আরও লক্ষ্যভিত্তিক ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (National Social Protection Strategy-NSPS) প্রণয়ন করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার খাতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বর্তমান বাজেটের ১৩.২৮ শতাংশ এবং জিডিপি ২.৩৪ শতাংশ।

শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণে সংশোধিত শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করা হয়। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দুই দফায় ১ হাজার ৩০০ থেকে ৫ হাজার ৩০০ টাকা পুনর্নির্ধারণের ফলে ২০১৩

সালের পর মজুরি বেড়েছে ৩ হাজার ৭০০ টাকা। পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা এবং বাংলাদেশের প্রধানতম শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে অর্থবছর ২০১২ থেকে অর্থবছর ২০১৮ সময়ের মধ্যে দেশে ও বিদেশে প্রায় ১ কোটি ৭৩ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এত কর্মসংস্থান আর অতীতে কখনও হয়নি।

দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে আরও লক্ষ্যভিত্তিক ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার খাতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বর্তমান বাজেটের ১৩.২৮ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৩৪ শতাংশ। এই খাতে বরাদ্দ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা থেকে ৪.৬ গুণ বাড়িয়ে চলতি অর্থবছরে ৬৪ হাজার ১৭৭ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের আওতায় ৭৫ হাজার ৯৯৩টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করে ৩৬.৩৯ লাখ পরিবারকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। ১ হাজার ৩৬৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা, ১ হাজার ১৫৫ কোটি ২১ লাখ টাকা কল্যাণ অনুদান (উৎসাহ বোনাস) ও ২ হাজার ২৮ কোটি ৯৮ লাখ টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান এবং সমিতিগুলো ২১৯ কোটি ৭৭ লাখ টাকা সেবামূল্য আদায় করেছে।

২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ লাখ ৮২ হাজার ৩৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় ১ লাখ ৫৮ হাজার ৫২৯টি পরিবারকে নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের জন্য ১ লাখ টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২.৩ কৃষি

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার কর্মসূচি। এ লক্ষ্যে ফসলের উন্নতজাত উদ্ভাবন ও বীজ সরবরাহ, কৃষি উপকরণ প্রণোদনা প্রদান, সুষম সারের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রবর্তন ও কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, কৃষি খাত উন্নয়নে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা, কৃষি উপকরণ সহায়তা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সুবিধার মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ, কৃষকদের ডাটাবেইজ তৈরিকরণ, প্রশিক্ষণ, শস্য বহুমুখীকরণ, কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃজন, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান, কৃষি গবেষণা, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কৃষি গবেষণার জন্য এনডাউমেন্ট ফান্ড মঞ্জুর এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার্থে জৈব সার ব্যবহার উৎসাহকরণের কার্যক্রম প্রতিবছর অব্যাহতভাবে করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কৃষি খাতে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ধানের উৎপাদন ৩ কোটি ৮০

লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। সেই সঙ্গে সরকারকে আর চাল আমদানি করতে হয় না। গম ও ভুট্টার উৎপাদনও বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। মোট দানা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন চলতি বছরের ৪.৩২ কোটি টন, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। তন্মধ্যে ধান ৩৭৩.৬৪ লাখ টন, গম ১১.৪৮ লাখ টন, ভুট্টা ৪৬.৯৯ লাখ টন। ডাল জাতীয় ফসল ছাড়া শাক-সবজি, ফলমূল, তেল, আলু, গম, ভুট্টা ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে ধান উৎপাদনে চতুর্থ, আম উৎপাদনে সপ্তম, আলু উৎপাদনে অষ্টম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম এবং সবজি উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দেশ।

২.৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে মৎস্যজীবীদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান, অভয়াশ্রম স্থাপন, সমবায়ভিত্তিক মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির মতো নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্যসম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ মাত্রা নির্ণয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিগত ১০ বছরে মাছের উৎপাদন ২৭.০১ লাখ টন থেকে বেড়ে ৪১.৩৪ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মৎস্য উৎপাদনকারী দেশ। দুধ, ডিম, মাংসসহ অন্যান্য পুষ্টি জাতীয় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন যথাক্রমে ২৯.৫০ লাখ টন, ১৯.৯০ লাখ টন ও ৬০৭ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যথাক্রমে ৯৪.০৬ লাখ টন, ৭২.৬০ লাখ টন ও ১৫৫২ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

গবাদি পশু-পাখির টিকা উৎপাদন, চিকিৎসাসেবা প্রদান, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ স্বল্প সুদে (৪.০ শতাংশ হারে) ঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিপন্ন প্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য মুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপন এবং প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। মাছ, দুধ, ডিম, মুরগি, গবাদি পশুর বাণিজ্যিক উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির ব্যাপারে উৎপাদক পর্যায়ে রাজস্ব ও আর্থিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

২.৫ শিক্ষা

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষা খাতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে শতভাগ শিশুর ভর্তি, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রতিবছর বিনামূল্যে বই বিতরণ, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষার প্রবর্তন, ঝরে পড়ার হার হ্রাস, ছাত্রী সংখ্যা

আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি এবং প্রাথমিকে ১ কোটি ৩০ লাখ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় ২৪ লাখ ৫০ হাজার ৬৯৪ শিক্ষার্থীর মাঝে সরকারি উপবৃত্তি প্রদান প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতির স্বাক্ষর। ২০১৯ সালের পহেলা জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২ কপি বই বিতরণ করা হয়েছে। মোট ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে। যে সকল উপজেলায় সরকারি স্কুল ও কলেজ নাই সেখানে একটি করে স্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৯ সালে সারাদেশে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক কলেজ মিলিয়ে সর্বমোট ১ হাজার ৬৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ৪৯৫ গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষকসহ শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও বেতন ভাতা বৃদ্ধি এবং ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান, কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা, প্রতি উপজেলায় একটি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে পরিণত করার কার্যক্রম দ্রুততার সাথে চলছে। বিগত দিনে আওয়ামী লীগ সরকার ১৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অনুমতি প্রদান করেছে। ১ হাজার কোটি টাকা স্থায়ী তহবিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়ক ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। দেশের শিক্ষার হার ৭৩.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

২.৬ স্বাস্থ্য

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে স্বাস্থ্য খাতের মূল নির্দেশকগুলোর ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে নারী প্রতি মোট সন্তান জন্মহার ২.০৫ শতাংশে নেমে এসেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০১৯ সালে ১.২৭ শতাংশে নেমে এসেছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭৩ বছর। একই সময়ে শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২৪ জন, যা ২০০৫ সালে ছিল ৫৬ জন এবং পাঁচ বছর বয়সের নিচের শিশুদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার নেমেছে ২৪ জনে, যা ২০০৫ সালে ছিল ৮২ জন। মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখ্যযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। মাতৃমৃত্যু হার বর্তমানে প্রতি ১ লাখ জীবিত জন্মে ১৬৯ জন, যা ২০০৫ ছিল ৩২০-৪০০ জন। এমডিজি'র প্রায় সকল ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বাংলাদেশের অর্জনগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিপুলভাবে স্বীকৃত।

তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে নতুন হাসপাতাল নির্মাণ, বিদ্যমান হাসপাতালসমূহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, শয্যা সংখ্যা ও নানা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিসেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০১৬-২৫ সময়ে 'পুষ্টি পরিকল্পনা-২' ঘোষিত হয়েছে। পথ্য ও ঔষধ সামগ্রী

খাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধির ফলে রোগীদের উন্নতমানের খাবার সরবরাহ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৮৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ হতে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে মোট সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ১৪ থেকে বাড়িয়ে বর্তমানে ৩৬-এ উন্নীত করা হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫টি। এছাড়া সামরিক ব্যবস্থাপনায় ৬টি মেডিকেল কলেজ পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে ৫টি বর্তমান সরকারের আমলে স্থাপন করা হয়েছে। সরকার প্রতিটি বিভাগে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিটি জেলায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সারাদেশে ৪৩টি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও ২০টি নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় নেওয়ার জন্য সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। অথচ চারদলীয় বিএনপি-জামাত সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে রাজনৈতিক হিংসার বশবর্তী হয়ে ১০ হাজারেরও বেশি ক্লিনিক বন্ধ করে লাখ লাখ মানুষকে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত করে। এই ক্লিনিকগুলো থেকে প্রতিদিন শত শত মানুষ এখন চিকিৎসাসেবা নিচ্ছে। ক্লিনিকগুলো থেকে ৩০-৪০টি ঔষধ রোগীদের মাঝে দেওয়া হয়ে থাকে। ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামবাংলার সকল মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ বর্তমান সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মূল কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগের সকল শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত ৪ হাজার ৪৪৩ জনসহ গত ১০ বছরে প্রায় ১৮ হাজার ডাক্তার নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী ১ লাখ পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণ করা হয়। সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪ হাজার ১১০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্রের মধ্যে ৩ হাজার ৩৫৫টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্রে সপ্তাহের প্রতিদিন সার্বক্ষণিক সাধারণ প্রসবসেবা, ৯৮টি মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্রের মধ্যে ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণকেন্দ্রে জরুরি প্রসূতিসেবা প্রদান করা হচ্ছে। গর্ভবতী মায়েদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ মা চিহ্নিতকরণসহ প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান সহজতর হয়েছে।

বেশ কয়েকটি হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে টেলিপ্যাথি সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের রোগীরা হাসপাতালে না এসেও ৬৪টি জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সপ্তাহে প্রতিদিন সার্বক্ষণিক

বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছেন। অতি সম্প্রতি আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে কুষ্ঠ রোগ নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানের ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নতুন করে মোট ১ লাখ ৩৭ হাজার ২৪টি শয্যা স্থাপন করা হয়েছে। ১০ বছরে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়েছে। বর্তমানে শয্যা ও রোগীর অনুপাত ১ : ১১৬৯, যা ২০০৬ সালে ছিল ১ : ২৬৬৫। ১০ বছরে ২১ হাজার ৬৮৮ জন নার্স নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রায় ৮ হাজার নার্সের নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে দেশীয় চাহিদার ৯৮ শতাংশ ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। পৃথিবীর ১৪৫টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করা হচ্ছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটাল; জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস অ্যান্ড হসপিটাল; চট্টগ্রাম, শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট; বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট; গোপালগঞ্জ, ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইপনা); শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি অ্যান্ড হসপিটাল; শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন স্থাপন করা হয়েছে।

২.৭ বিদ্যুৎ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণকালে দেশে ছিল চরম বিদ্যুৎ সংকট। বিরাজ করছিল এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। মাত্র তিন বছরে এ সংকট সমাধান করার অঙ্গীকার করা হয় এবং সাফল্যের সাথে তা বাস্তবায়ন করা হয়। নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১১ সালের মধ্যে ৫০০০ মেগাওয়াট এবং ২০১৩ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৭০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে কিস্তি প্রণোদনা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ২০১১ সালের মধ্যেই এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালে ৪৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বর্তমানে ২০১৯ সালের এ পর্যন্ত ২২৭২৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। এতে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৫১০ কিলোওয়াট। মোট জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। গুরুত্বপ্রাপ্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে আসছে ৪৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চীনের একটি কোম্পানির সাথে সমঝোতা স্মারক সই করেছে সরকারি একটি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া ভারত থেকে ১১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন রয়েছে নতুন ৫৫টি স্থায়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র। যেগুলো হওয়ার পর কুইক রেন্টাল ছাড়াই ২০২১

সালের শেষে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হবে প্রায় ২৪০০০ মেগাওয়াট। বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ প্রকল্প ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। এছাড়া মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড প্রকল্প কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ করে যথাক্রমে ১১ হাজার ৯০৫ সার্কিট কিলোমিটার ও ৫ লাখ ৫০ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। সিস্টেম লস ২০০৮ সালের ১৫.০৬ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ৯.৩৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সহায়তা দেওয়ার জন্য লাইফ লাইনে প্রতি ইউনিটে ৪ টাকা, নিম্নবিত্তের মানুষের জন্য ৩.৫০ টাকা, কৃষিতে ৮৮ শতাংশ, কৃষির গ্রাহককে তার মোট বিলের ওপর ২০ শতাংশ, মধ্যবিত্তের জন্য (৩০০ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারী) ৪৫ শতাংশ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে দেশের মোট ২০টি গ্যাসফিল্ড ও আমদানিকৃত দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে ১ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসসহ দৈনিক ৩ হাজার ৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও শাহবাজপুর, সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও ভোলায় নতুন ৪টি গ্যাসক্ষেত্র এবং সিলেটের কৈলাশটিলা ও হরিপুরে দুটি নতুন তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ২০০৯-১৯ পর্যন্ত গ্যাসের উৎপাদন বেড়েছে দৈনিক ১০০৬ মিলিয়ন ঘনফুট। গত ২০০৮ সালের তুলনায় বর্তমানে দেশে দৈনিক ৩ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। এই সরকারের সময় ৮৬২ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। আরও ৩৫৭ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি 'এনার্জি ডিপ্লোমেসি'কে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। এই খাতের যুগান্তকারী ঘটনা ভেড়ামারা ও ত্রিপুরায় ক্রসবর্ডার কানেকশন। ভারতের ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরা থেকে যথাক্রমে ১৪৯৬ ও ৩৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভুটান ও নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে ভারত অংশীদার হিসেবে থাকছে।

সমুদ্র বিজয়ের ফলশ্রুতিতে ৭টি সমুদ্র ব্লকে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহ একক ও যৌথভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ২০০৯-১৮ পর্যন্ত দেশে জ্বালানি তেল সরবরাহ ৪৫.৮৯ মেট্রিক টন এবং এলপিজি সরবরাহ সাড়ে ৬ লাখ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৮ যোগাযোগ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার সবিশেষ গুরুত্বের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৪১৭ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক চার-লেনে উন্নীত করা হয়েছে : ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ, নবীনগর-চন্দ্রা, রংপুর মহানগর এবং চট্টগ্রাম-হাটহাজারী। গাজীপুর থেকে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত চার-লেনে উন্নীত করার কাজ সমাপ্তির পথে। যাত্রাবাড়ী থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত আট-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। কর্ণফুলী নদীতে ট্যানেল নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ৯১৪টি সেতু, ৩ হাজার ৯৭৭টি কালভার্ট নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা, টঙ্গী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ফেনীতে ৭টি ফ্লাইওভার এবং বেশ কিছু আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে। আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক চার-লেনে উন্নীতকরণের সমীক্ষা ও নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের যুগান্তকারী পরিকল্পনা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর নির্মাণকাজ ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায়, ২০২১ সাল নাগাদ এই সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ফ্লাইওভার নির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। কুড়িল-বিশ্বরোড বহুমুখী ফ্লাইওভার, মিরপুর-বিমানবন্দর জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, বনানী ওভারপাস, মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, টঙ্গীতে আহসান উল্লাহ মাস্টার ফ্লাইওভার এবং চট্টগ্রামে বহদ্দারহাট ফ্লাইওভারগুলো ব্যাপকভাবে যানবাহন চলাচলে ব্যবহৃত হচ্ছে। মগবাজার-মালিবাগ-শান্তিনগর ফ্লাইওভার ব্যবহৃত হচ্ছে। মেট্রোরেল (উত্তরা-মতিঝিল) নির্মাণকাজের অগ্রগতি ৩৮.৩৫ শতাংশ। ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগের চুক্তি ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬.৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পিপিপি প্রকল্প চলমান রয়েছে। ঢাকা মহানগরের হাতিরঝিল একটি আধুনিক ও নান্দনিক স্থাপত্য শিল্পের অনন্য নিদর্শন এবং নগরবাসীর বিনোদনের জন্য আকর্ষণীয় এলাকা।

আওয়ামী লীগ সরকার শুরু থেকেই সুলভ, নিরাপদ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী যোগাযোগ মাধ্যম রেলের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এই ধারা অব্যাহত আছে। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সালে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি হরতাল ও অবরোধের নামে সন্ত্রাস ও নাশকতা করে রেলের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। সরকারের ঐকান্তিক

চেষ্টায় এই ক্ষতি কাটিয়ে গত ১০ বছরে ৩৩০.১৫ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ, ৯১টি স্টেশন বিল্ডিং, ২৪৮.৫০ কিলোমিটার মিটারগেজ থেকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর, নতুন ৭৯টি রেলস্টেশন নির্মাণ এবং ২৯৫টি রেলসেতু নির্মাণ করা হয়েছে। রেলওয়ের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ৩০ বছর মেয়াদি একটি মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) সহযোগিতায় চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ১২৯.৫ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণের কাজ ২০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিকভাবে সফল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৯ বন্দর ও নৌপথ উন্নয়ন

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর এবং স্থলবন্দরগুলোর চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ফলে বন্দরের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পায়রা বন্দরকে একটি পূর্ণাঙ্গ বন্দর হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি মহাপরিকল্পনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সীমিত আকারে বন্দর চালু করা হয়েছে। দেশের নৌপথের নাব্য সংরক্ষণে চলমান ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ২০০৯ থেকে ২০১৩ সময়কালে ১৪টি এবং পরে আরও ২০টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রায় ১১ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজ চলছে। মোংলা বন্দর ও মোংলা এলাকায় ইকোনমিক জোন, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে খুলনা বিমানবন্দর বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের মধ্যে মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দর নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ১৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বে-টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বন্দরের সক্ষমতা ৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

২.১০ শিল্প উন্নয়ন

উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিল্পায়নের গুরুত্ব খুবই বেশি। দেশে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ-যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান ও কাজের উৎস সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার বিপুল শ্রমশক্তি কাজে লাগাতে শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন কৌশলের ওপর জোর দিয়ে যাচ্ছে। সে-সঙ্গে গুরুত্ব পাচ্ছে ভারী ও মৌলিক শিল্প– যে শিল্পকে ভিত্তি করে বহুমাত্রিক সংযোজন শিল্প গড়ে উঠবে। আওয়ামী লীগ সরকার অব্যাহতভাবে পোশাক শিল্পের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বা প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি অর্জিত হয় এই খাত হতে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ধ্বংসকারী পলিথিন ও প্লাস্টিক পণ্য নিষিদ্ধকরণের ফলে পাটপণ্যের চাহিদা বাড়ছে। ইতোমধ্যে সরকারের সহযোগিতায় বিজ্ঞানীরা পাটের জন্ম রহস্য উন্মোচনসহ পলিথিনের বিকল্প সোনালি ব্যাগ উদ্ভাবন করেছেন। পাট পণ্যের সংখ্যা ৩৫ হতে বেড়ে ২৮৫-তে দাঁড়িয়েছে। শিল্পায়নে জমির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার

লক্ষ্যে সরকার ১০০টি সরকারি ও বেসরকারি ইকোনমিক জোন স্থাপনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে; এ পর্যন্ত ৯০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং ২৪টির কাজ এগিয়ে চলছে। প্রতিটি শিল্পাঞ্চলে বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সাভারে চামড়া শিল্পের বর্জ্য শোধনকারী কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে, যা পরিবেশবান্ধব শিল্পের শর্ত পূরণ করে চামড়া জাতীয় পণ্যের রপ্তানি বহুগুণ বৃদ্ধি করবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কর অবকাশসহ বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ইকোনমিক জোনের জন্য বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। বিগত ১০ বছরে ইপিজেডে ৪৭৬টি শিল্প স্থাপন করা হয়েছে। বন্ধুপ্রতিম দেশ চীন, জাপান ও ভারতের জন্য ৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সংরক্ষিত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তা দান, তাঁত শিল্প রক্ষা ও রেশম, বেনারসি এবং জামদানি পল্লি গড়ে তুলে তাঁতি, কামার, কুমার ও মৃৎশিল্পীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান ও ঋণের শর্ত সহজীকরণের জন্য পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তা ইউনিট খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ যাতে জামানতের অভাবে ব্যাংক ঋণ থেকে বঞ্চিত না হয়, সে-লক্ষ্যে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিআইডিএ) গঠন, বিভিন্ন প্রকার রপ্তানি প্রণোদনা ও ২৭টি রপ্তানি পণ্যে ২ থেকে ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু এবং ইজ অব ডুইং বিজনেস ক্রম উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১১ ডিজিটাল বাংলাদেশ

আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রযুক্তি জ্ঞান আহরণ ও প্রয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। তা বিবেচনা করেই ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। আইসিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উৎসাহ আর উদ্যোগ ছাড়াও তার সুযোগ্য সন্তান আইটি বিশেষজ্ঞ ও তথ্য-প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের অবদান জাতীয় পরিমণ্ডল পেরিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আর এখন স্বপ্ন নয়, বাস্তব। শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ ছাড়াও প্রশাসন, ব্যাংকিং, চিকিৎসাসেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং গণযোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ এখন অনেক এগিয়ে আছে। বাংলাদেশে এখন মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা ১৬ কোটিরও বেশি, ইন্টারনেট গ্রাহক ৯ কোটি ৬২ লাখে উন্নীত হয়েছে। দেশের ইন্টানেট চাহিদা পূরণে ফোর-জি'র মতো নতুন সেবার লাইসেন্স প্রদানের পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করেছে সরকার। বর্তমানে ফোর-জি'র গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৯১ লাখ। দেশব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে। সারাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ,

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ওয়ার্ডসমূহে বর্তমানে মোট ৫ হাজার ৭৩৭টি ডিজিটাল সেন্টার এবং ৮ হাজার ২০০টি ই-পোস্ট অফিসের মাধ্যমে জনগণকে ২০০ ধরনের ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সর্বস্তরের জনগণের হাতের মুঠোয় তথ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২৫ হাজার অফিসের তথ্য নিয়ে নির্মিত বাংলাদেশের 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। যেখানে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে টেলি ডেনসিটি ছিল মাত্র ১৩.৪৪ শতাংশ, ২০১৯ সালে এসে তা ৯৯.৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তথ্যপ্রবাহ অবারিত করে দেওয়ার পাশাপাশি জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তথ্য অধিকার আইন এবং গঠন করা হয়েছে তথ্য কমিশন।

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরে এবং যশোরে হাই-টেক পার্ক নির্মাণের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। সিলেটে ইলেকট্রনিক্স সিটি শীর্ষক প্রকল্প ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও ঢাকার মহাখালিতে আইটি ভিলেজ, রাজশাহীতে বরেন্দ্র সিলিকন সিটি, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে খুলনা আইটি পার্ক এবং মাগুরায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ৫৮ হাজার ৯২১টি প্রাথমিক ও ২৩ হাজার ৩৩১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ৭ হাজার ৫৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। পড়াশোনার বিষয়কে আনন্দদায়ক, যুগোপযোগী ও কার্যকরী করে উপস্থাপনের জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ৩০০টি পাঠ্যপুস্তক এবং ১০০টির বেশি সহায়ক বইকে ডিজিটাল টেক্সটবুক বা ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে। 'Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৪ হাজার আইটি প্রফেশনাল তৈরির লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১০ হাজার আইটি গ্রাজুয়েটকে IT Top Up এবং ২০ হাজার জনকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩ হাজার সরকারি কর্মকর্তাকে ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আইটি বিষয়ে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১ হাজার ৮১১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ১ লাখ ৪৪ হাজার পুরুষ ও ৫৬ হাজার মহিলাকে Basic ICT Literacy-র ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 'প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের মাধ্যমে ২১ জেলার সর্বমোট ১০ হাজার ৫০০ নারীকে প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশিপ প্রদান করা হয়েছে। আইসিটিভিত্তিক উদ্ভাবনীকে প্রণোদনা দেওয়ার জন্য ইনোভেশন ফান্ডের মাধ্যমে শতাধিক প্রকল্প চলমান রয়েছে। উদ্ভাবনকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া ও এই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রোগ্রামিং কনটেস্ট, আইসিটি বির্তক প্রতিযোগিতা, ইন্টারনেট সপ্তাহ, হ্যাকাথন, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, আইসিটি এক্সপো প্রভৃতি আয়োজন করা হয়।

সরকারের আইসিটি বিভাগ নাগরিক সেবা সহজলভ্য করতে ৬০০টি মোবাইল অ্যাপস নির্মাণ করেছে। নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, সরকারি অফিসের কাজে গতি ও স্বচ্ছতা

আনয়ন এবং আইটি ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়, সকল অধিদফতর এবং ৮টি বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সহ সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের পাশাপাশি স্মার্টকার্ড চালু করা হয়েছে। রেলওয়ের টিকিট ক্রয়ে মোবাইল টিকেটিং এবং ই-টিকেটিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সারাদেশে ২৪৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে প্রথম পর্যায়ে ২৮টি হাই-টেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩টি পার্কের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এবং নতুন সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২.১২ আইনের শাসন

শান্তি, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্য সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন ও বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। জেলহত্যার পুনর্বিচার করা হয়েছে। জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে কয়েকজন কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীর। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি দেখানোর ফলে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূল হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা মামলার রায় হয়েছে। দশ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালানির মামলার রায় হয়েছে, আসামিরা সাজা পেয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার দুই পুত্রের অর্থপাচার মামলায় আদালত শাস্তির রায় দিয়েছেন। বর্তমানে খালেদা জিয়া এতিমের অর্থ আত্মসাতের মামলায় দুর্নীতির দায়ে কারাগারে রয়েছেন। মাদকের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮ প্রণয়ন ও কার্যকরা করা হয়েছে।

জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী গ্রহণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে আবার '৭২-এর সংবিধানের মৌলিক নীতি কাঠামো পুনঃস্থাপিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রাষ্ট্র পরিচালনার সকল আইনগত বাধা অপসারিত হয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো গঠিত হয়েছে। ক্রমশই জাতীয় সংসদ সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নিজের অবস্থান দৃশ্যমান করে তুলেছে।

প্রথমবারের মতো সকল দলের সঙ্গে আলোচনা ও সার্চ কমিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বর্তমান নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করেন। অবাধ, নিরপেক্ষভাবে দেশের স্থানীয় সরকারগুলোর

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনগুলোও সকলের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। নির্বাচন কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা ও জনবল নিয়োগের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

দেশের বিচার বিভাগ এখন স্বাধীন। আইন সংস্কারের জন্য ল' কমিশন গঠন করা হয়েছে। মানবাধিকার কমিশন ইতোমধ্যে দেশের সকল দলমতের মানুষের আস্থা অর্জন করেছে।

২.১৩ পরিবেশ

উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় সমগ্র মানব জাতির জন্য উদ্বেগ ও আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট মোকাবেলা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকার ধারাবাহিকভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় মেয়াদে এ বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্বসহকারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স-২০২০-এ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ১০টি দেশের মধ্যে সপ্তম অবস্থানে আছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে আন্তর্জাতিক ফোরামে স্বল্পোন্নত দেশের হয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। সেই ধারা অব্যাহত রেখে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা COP-25 এ বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দের প্রতি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, 'আমরা ব্যর্থ হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।'

বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য গত ২০০৯ সালে Bangladesh Climate Change Strategic and Action Plan (BCCSAP) তৈরি করেছে। মহান জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাবও পাস হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। যার অধীনে ৪৪০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ডিসেম্বর ২০১৫ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC)-Gi Party সমূহের ২১তম সম্মেলন (COP-21) বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ধরে রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ গত ২২ এপ্রিল ২০১৬ প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় UNDP-এর সহায়তায় National Adaption Plan (NAP) তৈরি করেছে এবং এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন কার্যক্রমসমূহ সম্পৃক্ত রেখে 'জাতীয় পরিবেশ নীতি-২০১৮' প্রণীত হয়েছে। ইতোমধ্যে খসড়া 'বন আইন-২০১৯' এর ওপর সর্বসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ২৫ মিলিয়ন মানুষ সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৩ শতাংশ। কৃষিতে ডিজেলচালিত পানির পাম্পের বিকল্প হিসেবে সৌর সেচপাম্প স্থাপন উৎসাহিত করা

হচ্ছে। রান্নার কাজ থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে ২০ লাখ উন্নত চুলা সরবরাহ করা হয়েছে। দেশব্যাপী বায়ুমান পরিবীক্ষণ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর 'নির্মল বায়ু আইন-২০১৯' এর খসড়া প্রণয়ন করেছে। ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে ১৬টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (CAMS) পরিচালিত হচ্ছে এবং ১৫টি Compact CAMS স্থাপিত হয়েছে। জলাবদ্ধ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল হিসেবে ভাসমান সবজি-মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৫ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। উপকূলীয় ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সমুদ্রের কাছাকাছি নিকট দূরত্বে মোট ২ হাজার ২৮০ কিলোমিটার (রৈখিক দৈর্ঘ্য) উপকূলীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার প্রায় ৯৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকা ইতোমধ্যে বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী সৃজন করা হয়েছে। ৫১২ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ২ লাখ ৮৫ হাজার ৬০ হেক্টর উপকূলীয় বনায়ন করা হয়েছে।

২.১৪ নারী ও শিশু

জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (CEDAW) ও বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (সিআরসি)-সহ সকল আন্তর্জাতিক সনদ অনুসরণে সরকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়নে আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারাবদ্ধ। 'নারীনীতি-২০১১' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 'যৌতুকবিরোধী আইন-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার থেকে প্রদান করা হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫টি বাড়িয়ে ৫০ করেছে। রাজনীতিতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং পৌরসভা ও মহানগর কর্পোরেশনে নারী আসন এক-তৃতীয়াংশে উন্নীতকরণ ও সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে কর্মোপযোগী পরিবেশ সৃজন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনসহ তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, সচিবসহ প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের বিভিন্ন পদে পদায়ন-নারী ক্ষমতায়নের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। নারীর ক্ষমতায়নে অনন্য অবদানের জন্য জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' এবং 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। 'গ্লোবাল উইমেনস

সামিট-২০১৮'তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়।

২.১৫ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু-কিশোরদের কল্যাণে 'অটিজম ট্রাস্ট' গঠনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও তার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের উদ্যোগে জাতিসংঘে অটিজমের বিষয়ে কল্যাণমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়েছে, যার উপকারভোগী ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৬৪২ জন। প্রতিবন্ধীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশকে মসৃণ করার জন্য সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার মিরপুরে ১৫ তলা বিশিষ্ট জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স 'সুবর্ণ ভবন' উদ্বোধন করেছেন। সকল বিভাগীয় সদরে ১০টি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যাতে আত্ম-কর্মসংস্থানে উৎসাহিত হয় সেজন্য সরকারি উদ্যোগে মেলার আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রতিবন্ধীদের তৈরিকৃত পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন ও বাজারজাতকরণ করা হয়। ব্যাচেলর অব স্পেশাল অ্যাডুকেশনের মাধ্যমে প্রায় ৬০০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কারিগরি, সেলাই, নাচ ও গান, চারু ও কারুকলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য Job Fair-এর আয়োজন করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়াও সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি সম্প্রসারণ করেছে। চলমান অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুবিধাভোগীর সংখ্যা হবে ৮৫ লাখেরও বেশি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত নীতি হলো 'সবার জন্য বাসস্থান নিশ্চিতকরণ'। এর অংশ হিসেবে ৫০ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং এই অর্থবছরে আরও ৮ হাজার ৫০০টি পরিবার সংযুক্ত হয়েছে। চর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় ১২ হাজার ৮৬৮টি পরিবারকে খাস জমির বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। ঢাকায় নিম্নবিত্তদের পুনর্বাসনের জন্য ভাষানটেকে আবাসন প্রকল্পের নির্মাণকাজ প্রক্রিয়াধীন। ইতোমধ্যে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে তাদের বিশেষ ভাতা ৫০০ টাকা হতে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছে। স্কুলগামী হিজড়াদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪টি পর্যায়ে যথাক্রমে প্রাথমিকে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিকে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিকে ১ হাজার টাকা এবং উচ্চতর পর্যায়ে ১ হাজার ২০০ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। হিজড়াদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণোত্তর ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তাদের ভাতা ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ১৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

২.১৬ ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী

মহান জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে আওয়ামী লীগ '৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। সকল ধর্মের সমান অধিকার এবং দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতিদের অধিকার ও মর্যাদার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে ধর্মীয় ও নৃ-জাতিসত্তাগত সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসান এবং তাদের জীবন, সম্পদ, উপাসনালয়, জীবনধারা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা দৃঢ়ভাবে সমুন্নত থাকবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জমি, বসতভিটা, বনাঞ্চল, জলাভূমি ও অন্যান্য সম্পদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা-বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির অনেক ধারা বাস্তবায়ন করা হয়েছে, অবশিষ্ট অঙ্গীকার ও ধারাসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। পার্বত্য জেলাগুলোর উন্নয়নে ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং তিন পার্বত্য জেলার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখা, বনাঞ্চল, নদী-জলাশয়, প্রাণিসম্পদ এবং গিরিশৃঙ্গগুলোর সৌন্দর্য সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এই তিন জেলায় পর্যটন শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের বিকাশে ইতোমধ্যে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১৭ মুক্তিযোদ্ধা

২০০৯ সাল হতে পর্যায়ক্রমে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার হার মাসিক ৯০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে মাসিক ১০ হাজার টাকায় এবং বর্তমানে ১২ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বিজয় দিবস, ঈদ ও বাংলা নববর্ষের উৎসব ভাতা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় ১২৫ লিটার পানি ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা পর্যায়ক্রমে ১ লাখ থেকে বৃদ্ধি করে ২ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবসরকালীন বয়স ৬০ বছর করা হয়েছে। ৫৩টি জেলা ও ৩৮৩টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ সমাপ্তির পথে। বিভিন্ন শ্রেণির সর্বমোট ৭ হাজার ৮৩৮ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, শহিদ পরিবার ও বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের মাসিক রাষ্ট্রীয় ভাতার পরিমাণ ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বার্ধক্যকালীন ভরণ-পোষণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং ৬০ ও তদূর্ধ্ব বয়সের সকল মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে রেল, বাস ও লঞ্চে বিনামূল্যে চলাচলের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়স্তম্ভের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদের বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

২.১৮ ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

শক্তিশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজই প্রধান শক্তি। দেশের যুবসমাজকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে সারাদেশে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে উঠে আসবে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ। এ-সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার উদ্দেশে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং যুব বিনিময় কর্মসূচিসহ আরও অনেক কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। বিভিন্ন খেলায় প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড় খুঁজে বের করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ২০১৯ সালে ১ হাজার ৫০ ক্রীড়াসেবীকে মোট ১ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন ক্রীড়া ফেডারেশন এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। এজন্য ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৬৬টি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম, ৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিকেএসপি'র স্পোর্টস কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন। ৫,৫৬৪ লাখ টাকা ব্যয়ে দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। যার মধ্যে ১২৫টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিশ্ব ক্রিকেটে বর্তমানে বাংলাদেশ গৌরব জাগানো অবস্থান করে নিয়েছে। এই ধারা অব্যাহত রেখে ফুটবল, হকিসহ অন্যান্য খেলায় আরও এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

পাশাপাশি আবহমান ঐতিহ্যবাহী বাংলার সংস্কৃতি বিকাশ ও সুরক্ষায় সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলা এবং ৪৯০ উপজেলায় জনসচেতনামূলক পথ নাটক, গণসংগীত পরিবেশন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়মিত পহেলা বৈশাখ উদযাপন, বসন্ত উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি, বর্ষাবরণ, নবান্ন উৎসব আয়োজনে অব্যাহত সহযোগিতা করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক জঙ্গিবাদ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদ প্রতিরোধে সুস্থ বাঙালি সাংস্কৃতিক চর্চায় সরকারের প্রণোদনা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে।

২.১৯ প্রতিরক্ষা

আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন শক্তিশালী। সেনা,

নৌ ও বিমান বাহিনীতে আধুনিক সমরাস্ত্র, যানবাহন এবং প্রযুক্তির সম্মিলন ঘটানো ছাড়াও সেনা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালা ১৯৭৪-এর আলোকে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। তাদের সুযোগ-সুবিধা যথাসম্ভব বাড়ানো হয়েছে। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী এখন একটি আধুনিক প্রফেশনাল অজেয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

সিলেট, রামু (কক্সবাজার) ও বরিশালে ৩টি ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠা, সেনাবাহিনীতে নতুন ৩টি পদাতিক ডিভিশন ও পদ্মাসেতু কম্পোজিট ব্রিগেডসহ বহু ইউনিট গঠন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন ও সমরশক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন প্রজন্মের ট্যাংক, সেলফ প্রপেলড গান, আধুনিক ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী অস্ত্র, অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার, লোকেটিং রাডার সংযোজন করা হয়েছে।

নৌবাহিনীর শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়নের জন্য বিদেশ থেকে নতুন যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমাদের নিজস্ব শিপইয়ার্ডে তৈরি যুদ্ধজাহাজও সংযোজন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টার সংযোজন করা হয়েছে। সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন নেভাল কমান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পটুয়াখালীতে একটি পূর্ণাঙ্গ নৌঘাঁটি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলছে।

বিমান বাহিনীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মতো ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রসহ সংযোজিত হয়েছে সর্বাধুনিক সরঞ্জাম। অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার সংযোজন এবং যুদ্ধবিমানসহ বিভিন্ন সরঞ্জামের সুষ্ঠু ও সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিক্যাল সেন্টার' স্থাপন আওয়ামী লীগ সরকারের একটি বিরাট অর্জন। ফোর্সেস গোল-২০৩০-এর আলোকে অত্যাধুনিক ও কারিগরিভাবে উৎকর্ষতাসম্পন্ন ১৬টি মাল্টি রোল কম্ব্যাট এয়ারক্র্যাফট এবং ৮টি এটাক হেলিকপ্টার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনী উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কল্যাণের জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের অবসর ভাতা ৩০ শতাংশ পেত, এখন তা ১০০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকীকরণে আমাদের সাফল্যের ফলে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষ স্থানে আছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সশস্ত্র

বাহিনী অনন্য অবদান রাখার জন্য সারাবিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছেন এবং দেশ ও জাতির সম্মান ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেছে।

সামরিক বাহিনীর জেসিও এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সমমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পদকে দ্বিতীয় শ্রেণি হতে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করা এবং বেতনের ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সার্জেন্ট পদকে তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। এসএসএফ, পিজিআর, ডিজিএফআই, এনএসআই, র‍্যাব ও বিজিবি-র দশম গ্রেড ও নিম্নপদের কর্মচারীগণ ঝুঁকি ভাতা পাচ্ছে।

২.২০ পররাষ্ট্র

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা মীমাংসা আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের এক বিরাট মাইলফলক। দ্য হেগের আন্তর্জাতিক সালিশি আদালতের রায়ে বঙ্গোপসাগরে ভারতের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার ৬০২ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে ১৯ হাজার ৪৬৭ বর্গকিলোমিটার পেয়েছে বাংলাদেশ। আর জার্মানির হামবুর্গভিত্তিক সমুদ্র আইনবিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের (ইটলস) রায়ে (মিয়ানমারের সাথে বিরোধপূর্ণ এলাকা থেকে) ১ লাখ ১১ হাজার বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ফলে এসব এলাকার সকল প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে তিন দশকের বেশি সময় ধরে উভয় রাষ্ট্রের সাথে বিদ্যমান সমস্যা, যা উভয় রাষ্ট্রের সমুদ্র সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তা আন্তর্জাতিক আইনের রায়ের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে। শুধু সমুদ্রসীমার ক্ষেত্রেই নয়, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ভারতের সঙ্গে স্থলসীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও ছিটমহল হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষরিত স্থলসীমান্ত চুক্তি ১৯৭৪ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মোট ১১১টি ছিটমহলে ১৭ হাজার ১৬০.৬৩ একর জমি বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্য অর্জনের ইতিহাসে সমুদ্রসীমা ও স্থলসীমান্ত সমস্যার মীমাংসা এক স্বর্ণোজ্জ্বল স্থান দখল করে থাকবে। জাতির এই অসাধারণ অর্জন সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধু-কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, সুচিন্তিত কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে।

মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধ এবং রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে দ্বি-পক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত আছে। আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে বহুমুখীকরণের উদ্যোগের অংশ হিসেবে সার্ক, বিমসটেক ডি-৮, আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (এআরএফ), এশিয়া

কো-অপারেশন, এশিয়া ইউরোপ মিটিংসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী, জঙ্গিবাদী ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহার করতে না দেওয়ার নীতি এশীয় অঞ্চলের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছে।

ভারতের সঙ্গে অন্যান্য অমীমাংসিত সমস্যাগুলোও পর্যায়ক্রমে সমাধান হচ্ছে। চীনসহ নিকট প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের বহুমুখী সহযোগিতার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বিশ্বসভায় বাংলাদেশ তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উত্থাপিত 'বিশ্বশান্তি, জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মডেল' সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচিত হওয়া, জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের প্রথম স্থান অর্জন (এপ্রিল ২০১২) প্রভৃতির ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে।

জাতিসংঘ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ভূমিকা, অবদান ও প্রস্তাব প্রশংসিত হয়েছে।

২.২১ দেশরত্ন শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার মধ্যে অনেকগুলো উদ্যোগই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনাপ্রসূত, যা ইতোমধ্যে 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে– আমার বাড়ি আমার খামার, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, আশ্রয়ণ, শিক্ষা সহায়তা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বিকাশ। সভানেত্রীর এসব উদ্ভাবনী উদ্যোগ সবিশেষ গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২.২২ উন্নয়ন, গণতন্ত্র, শান্তি ও সমতা প্রতিষ্ঠায় জননেত্রী শেখ হাসিনার সম্মোহনী নেতৃত্বের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি

দেশের উন্নয়ন হচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গীকার, নেতৃত্ব ও সাযুজ্যপূর্ণ নীতিমালা বাস্তবায়নের গভীর সংমিশ্রণ। গত দুই মেয়াদে নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের ফলে একটি নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়ে উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব অর্জন সাধিত হয়েছে, তা প্রধানত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অদম্য সাহস, উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফসল। তিনি বিশ্ব পরিমণ্ডলে দেশকে মর্যাদা ও সম্মানে এক অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছেন। সমসাময়িক রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা কেবল আওয়ামী লীগের নয়, সারাদেশের শক্তি ও সম্পদ, দুটোই। বিশ্ব পরিমণ্ডলে তিনি

এখন এক অনন্য কণ্ঠস্বর। তার দৃঢ় মনোবল, সাহসী নেতৃত্ব, ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সবকিছুর উর্ধ্বে উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে দেশে ও বিদেশে তুমুল জনপ্রিয় করে তুলেছে। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, তরুণদের অনুপ্রেরণা ও জঙ্গি প্রতিরোধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে অসংখ্য সম্মানজনক আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

- ২০১৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনিসেফ কর্তৃক মর্যাদাপূর্ণ 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়।
- ২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নিবিড় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে আন্তরিক প্রয়াস এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের স্বনামধন্য সংস্থা ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' এবং ৫ অক্টোবর ২০১৯ ভারতের কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়।
- ২০১৮-এর এপ্রিল মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০১৮'-এ ভূষিত হন।
- রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে মানবিক ও দায়িত্বশীল নীতির জন্য অনন্য নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বৈশ্বিক সংবাদ সংস্থা ইন্টার প্রেস সার্ভিস (আইপিএস) 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' এবং নিউইয়র্ক, জুরিখ ও হংকংভিত্তিক একটি অলাভজনক ফাউন্ডেশনের নেটওয়ার্ক গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন '২০১৮ স্পেশাল ডিস্টিংকশন অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট' সম্মাননা প্রদান করে। রোহিঙ্গাদের প্রতি তার এই মানবিক দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি 'মাদার অব হিউম্যানিটি' হিসেবে ভূষিত হয়েছেন।
- ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ কর্তৃক লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অসামান্য সাফল্যের জন্য তাকে আইএফআরসি-র পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
- ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মান 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্যা আর্থ' পুরস্কার গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা।

- টেকসই উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণে অবদানের জন্য ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন (আইটিইউ) পুরস্কার লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূরীকরণে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করায় ফাও বাংলাদেশকে 'ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড' পদকে ভূষিত করে, যার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি মিলেছে ২০১৫ সালে শেখ হাসিনার 'ফাও এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' পদক লাভ করার মধ্য দিয়ে। এটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশাল সাফল্যের স্বীকৃতি।
- নারী শিক্ষা ও নারীদের ক্ষমতায়নে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তিনি ইউনেস্কোর 'শান্তিবৃক্ষ' পুরস্কার লাভ করেন ২০১৪ সালে।
- দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড-২০১৩' প্রদান করা হয়।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বখ্যাত 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক-২০০৯', 'নেতাজী মেমোরিয়াল পদক-১৯৯৭', 'এম কে গান্ধী পদক-১৯৯৮' লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'সেরেস পদক' প্রদান করা হয়।
- বিশ্বশান্তি রক্ষায় দেশরত্ন শেখ হাসিনার অবদান আজ সর্বজন স্বীকৃত। ইউনেস্কোর 'ফেলিক্স হুফে বইনি' পদক শান্তির দূত শেখ হাসিনার বিশ্ব পরিসরে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের পরম স্বীকৃতি।

শেখ হাসিনার প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সাহসী নেতৃত্বের প্রভাব এতটাই সুবিস্তৃত যে, ২০১৬ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ফরচুন ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের তালিকায় দশম স্থানে রয়েছেন এবং ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তিনিই একমাত্র নারী নেতা হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। ২০১৮ সালে ফোর্বস ম্যাগাজিনের মতে, বিশ্বের ক্ষমতাধর শত নারীর তালিকায় রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা ২৬ নম্বরে স্থান করে নেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ঘোষণা ও কর্মসূচি

৩.১ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা সমুন্নত রাখা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মূল লক্ষ্য। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এমন একটি ভেদ-বৈষম্যহীন উন্নত সমৃদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমৃত্যু লালিত স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' এবং বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা এবং ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সমপর্যায়ে পৌঁছানোই হবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

(খ) মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অর্জিত সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি– (পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত) বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র, সকল ধর্ম, বর্ণ ও নৃ-গোষ্ঠীর সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অভীষ্ট লক্ষ্য।

(গ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, 'যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে।' জাতীয় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সংবিধানসম্মত শাসন কাঠামোর প্রতিটি স্তর পরিচালিত হবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা।

(ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার তথা লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা, নারী নির্যাতন বন্ধ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

(ঙ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সব ধরনের উগ্রবাদ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম অবস্থান (জিরো টলারেন্স) গ্রহণ করবে এবং আধুনিক পরমতসহিষ্ণু বহুদলীয় উদার গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গঠনে বদ্ধ পরিকর থাকবে।

৩.২ জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ

(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণসমূহ নিশ্চিত করবে। কর্মক্ষম সকল নাগরিকের কর্মসংস্থান, উপযুক্ত মজুরি, যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন, অবকাশ এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

(খ) (১) বাক্, ব্যক্তি, চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠন করার অধিকার, সভা-সমাবেশ ও নাগরিকের চলাফেরার স্বাধীনতা এবং ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

(২) সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা হবে। ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে গৃহীত তথ্য অধিকার আইনের আলোকে নিশ্চিত করা হবে জনগণের তথ্য অধিকার। গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও তাদের ওপর নির্যাতনের যে কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হবে।

(৩) যে কোনো অজুহাতে সংবিধান লঙ্ঘন, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণ অথবা বিঘ্ন সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে।

৩.৩ আইনের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা

(ক) আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমান মর্যাদা এবং আইনের আশ্রয় গ্রহণের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হবে। প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা লাভের অবাধ সুযোগের ব্যবস্থা করা হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা হবে।

(খ) সার্বজনীন মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করা হবে। মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করা হবে।

৩.৪ আওয়ামী লীগের উন্নয়ন দর্শন

(ক) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্নয়ন আওয়ামী লীগের উন্নয়ন দর্শন উৎসারিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এদেশের মাটি থেকে। এই উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং বঙ্গবন্ধু-কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রদর্শিত পথে জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি; তাদের জীবনযাত্রার ক্রমাগত মানোন্নয়ন। আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করে এনে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ সম্পদশালী উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। কেবল উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনই নয়, উন্নয়নের সুফল যাতে সকল মানুষ সমানভাবে পায় তা নিশ্চিত করা হবে। সমাজে বিদ্যমান শ্রেণি ও ধন-বৈষম্য দূর করা, গ্রাম ও শহরের পার্থক্য হ্রাস, ধর্ম, বর্ণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, নারী-পুরুষসহ সকল মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা, সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন এবং বিদ্যমান জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করাই হবে আওয়ামী লীগের উন্নয়ন দর্শনের মূল কথা। অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির প্রতিটি শাখার সৃজনশীল বিকাশে বিশ্বমান অর্জনের ভেতর দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবদান রাখা এবং বাঙালি জাতির জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ গৌরবের আসন প্রতিষ্ঠাই হবে আওয়ামী লীগের উন্নয়ন দর্শনের অভীষ্ট লক্ষ্য।

(খ) অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়ন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) ক্ষুধা-দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক সূচকসহ অধিকাংশ লক্ষ্যসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অর্জন করে বিশ্ববাসীর প্রশংসা লাভ করেছে। ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুসরণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে পরিকল্পিত উপায়ে ন্যায়বিচার, সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করবে, যাতে কেউ বাদ না পড়ে এবং দারিদ্র্য ও ক্ষুধার চির অবসান ঘটে। সেই সঙ্গে সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে।

(গ) যুব শক্তি সম্পৃক্ত উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্ধেক জনসংখ্যা এখন ২৫ বছর বয়সের নিচে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনমিতিক এই সুবিধা আরও ১৫-২০ বছর পাওয়া যাবে। দেশের কৃষিপ্রধান অর্থনীতি ও দ্রুত শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এ বিপুল যুবসমাজের অফুরন্ত তারুণ্যে শক্তি, মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎপাদনশীল ও আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা হবে। কৃষি, শিল্প ও অকৃষি খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা হবে। সেই সঙ্গে অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমশক্তি বর্ধিত হারে বিদেশে পাঠানোর সুযোগ সৃষ্টি করাও আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

(ঘ) নগর সুবিধা সংবলিত গ্রামোন্নয়ন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশে ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য জীবনমানের আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করবে, যাতে মানুষ গ্রামে থেকেই নগর

জীবনের সকল সুযোগ-সুবিধা পায় এবং সেই সঙ্গে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের প্রবণতাও হ্রাস পায়। এ লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, সুপেয় পানি, স্যানিটেশন, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি সেবা সম্প্রসারণ করা হবে।

(ঙ) বিশ্ব শান্তি, জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, একটি ভেদ-বৈষম্যহীন ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের কৌশল হিসেবে জনগণের ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠনে উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। শান্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারী-পুরুষের সমান অধিকার, রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের গণতন্ত্রায়ন এবং বৈষম্য ও বঞ্চনামুক্ত প্রাচুর্যময় উন্নত সমাজ গঠন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত অভিন্ন প্রক্রিয়া। গত ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'বিশ্ব শান্তি, জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মডেল' শীর্ষক তার ধারণা এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তার এই মডেল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগও তার এই মডেলকে দলের দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত শেখ হাসিনার এই মডেলের মূল রূপরেখাটি হলো– দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ; বৈষম্য হ্রাস; বঞ্চনার উপশম; মানবসম্পদ উন্নয়ন; প্রান্তজনকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা; সকলের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সুসংগতভাবে সকল প্রকার সন্ত্রাস দমন।

চতুর্থ অধ্যায়

উন্নয়ন-সুশাসনের লক্ষ্য ও কর্মসূচি

রূপকল্প-২০২১-এর আলোকে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০১০-২১) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার প্রথম মেয়াদের পাঁচ বছরে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রণীত প্রথম দীর্ঘমেয়াদি সুস্পষ্ট কর্মসূচি, যা উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে আসছে। 'রূপকল্প-২০২১'কে সামনে রেখে ২০০৯ সালে উন্নয়নের যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল তার গতি ও পরিধি সরকারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেয়াদে আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবৃদ্ধির গতি অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে এবং গত অর্থবছরে আশাতীতভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৮.১৫ শতাংশ হারে। প্রয়োজনীয় ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও বেসরকারি খাতের বিকাশোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশ আজ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গেছে, রচিত হয়েছে সুউচ্চ প্রবৃদ্ধির পথ।

দুটি মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তথা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০)-এর মাধ্যমে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১১-২১) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আর্থ-সামাজিক এজেন্ডার বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২০১৬ থেকে শুরু হয়েছে। প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণ, সর্বোচ্চ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য নিরসনের সাথে সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন ও প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মকৌশল, নীতি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

এমডিজি'র ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুমোদন করেছে। যাতে ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals) এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা (Targets) নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় এসডিজি'র গুরুত্ব সবিশেষ বিবেচনায় নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের সর্বোচ্চ দলিল হিসেবে বিবেচিত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০)-তে এসডিজি'র অভীষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সমন্বিত করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে এসডিজি'র অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক কার্যসংশ্লিষ্টতা বা SDG Mapping প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সাথে সমন্বিত করে সঠিক এসডিজি বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (SDG Action Plan) পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জন হবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিত্তি। অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মকৌশল ও নীতির ধারাবাহিকতা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অব্যাহত থাকবে।

অষ্টম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করা হবে প্রণীত নীতি-কৌশলের সাথে সাজুয্য রেখে। উন্নয়নের যে কর্মযজ্ঞ চলছে তার সাথে সম্পৃক্ত হবেন দলের আদর্শের প্রতি নিবেদিত, কর্মঠ, সাহসী ও ত্যাগী লাখ লাখ নেতাকর্মী, অংশীদার করা হবে দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে। এদেশের মানুষ তাদের মেধা, দেশপ্রেম, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা দিয়ে সকল বাধা-বিপত্তি, নাশকতা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করে দেশকে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 'রূপকল্প-২০২১'-এর ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগের সভানেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন জাতিকে উপহার দেবেন একটি নতুন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা 'রূপকল্প-২০৪১', যা প্রণয়নের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। এ রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও উন্নত জনপদ। বাঙালি হবে সারাবিশ্বের মাঝে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত জাতি।

'রূপকল্প-২০২১', 'রূপকল্প-২০৪১' এবং এসডিজি (২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ) বাস্তবায়নের প্রয়াসকে সামনে রেখে উন্নয়ন ও সুশাসনের নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও খাতওয়ারি কর্মসূচির রূপরেখা উপস্থাপন করা হলো, যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে সহায়ক হবে।

৪.১ দারিদ্র্য বিমোচন এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধান

- দারিদ্র্য বিমোচন করে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো আওয়ামী লীগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লক্ষ্যের অন্যতম। এই লক্ষ্য অর্জনে উচ্চতম প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা এবং সমাজে ক্রমবর্ধমান আয়-বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা আওয়ামী লীগের বিঘোষিত নীতি। দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম কৌশল হচ্ছে কৃষি ও পল্লি জীবনে গতিশীলতা। ইতোমধ্যে হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা হয়েছে। হতদরিদ্র, দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চলমান প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করা হবে। দেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেপনা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হবে। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের সংখ্যা ২.২ কোটির নিচে নামানো হবে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত প্রকল্প 'আমার বাড়ি আমার খামার', 'আশ্রয়ণ', 'গৃহায়ন', 'আদর্শ গ্রাম' ও 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা এবং এর সুবিধাভোগীদের সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি করা হবে। কর্মসংস্থান ব্যাংকে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে। এছাড়াও প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজনের নিয়মিত রোজগার নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য হাসিল করা হবে।

- চাল উৎপাদনের পাশাপাশি গম ও ভুট্টার উৎপাদনের ঊর্ধ্বমুখী ধারা অগ্রসরমান থাকবে। জনগণের সুস্বাস্থ্যের জন্য কেবল ভাত নয়, তার সাথে আমিষ জাতীয় ও অন্যান্য খাবার যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফলমূল, শাক-সবজির উৎপাদনও ক্রমাগত বাড়িয়ে যাওয়া হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, কৃষি ঋণ, ভর্তুকিসহ উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি সরবরাহ সুলভ ও সহজলভ্য করার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে সাধারণ মানুষ যাতে ভেজালমুক্ত নিরাপদ খাবার গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ শক্তিশালী করা হবে এবং নিরাপদ খাবার সম্পর্কিত সকল আইন প্রয়োজনমাফিক সংশোধন করে বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.২ কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও পল্লি উন্নয়ন

- 'সবার জন্য খাদ্য' আমাদের মূল লক্ষ্য ও অঙ্গীকার এবং সে-লক্ষ্যে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কৃষি, কৃষক ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণের ধারা অব্যাহত থাকবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা পূরণ, সার্বিক বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা (সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিসম্মত খাদ্য সরবরাহ ও প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ) ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বাণিজ্যিক কৃষির বিকাশ সাধন, কৃষিনির্ভর শিল্পের প্রসার, গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, কৃষি ও অকৃষিজ পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এই কৌশলের লক্ষ্য। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও কৃষিপণ্য বাজারজাত করার উদ্দেশে কৃষি সমবায়কে উৎসাহিত করা হবে। বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

- বর্গাচাষিদের জন্য ঋণ, ক্ষেতমজুর ও হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান ও তাদের কম মূল্যে (১০.০০ টাকা কেজি) চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের পদক্ষেপসমূহ জোরদার করা হবে।

- কৃষিতে শ্রমিক সংকট লাঘবের জন্য সহজে ব্যবহার্য ও টেকসই কৃষি যন্ত্রপাতি প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে সহজপ্রাপ্য করা হবে।

- বাণিজ্যিক কৃষি, জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্রামীণ অকৃষিজ খাতের উন্নয়ন, বিশ্বায়ন মোকাবিলায় উপযুক্ত কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা আরও জোরদার করা হবে।

- স্থানীয় পর্যায়ে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি পণ্যের দক্ষ সাপ্লাই চেইন/ভ্যালু চেইন গড়ে তোলা হবে।

- পল্লি উন্নয়নে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার পরিধি বিস্তৃত করা হবে। ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ, খাস জলাশয় ও জলমহাল প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বন্দোবস্ত দেওয়া হবে।

- জাতীয় ভূমিনীতি এবং ভূমি-সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা পর্যালোচনা করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও আধুনিক করার লক্ষ্যে সমুদয় জমির রেকর্ড ডিজিটালাইজ করা হবে। ভূমির অবৈধ দখল ও ভূমি দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করে ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে ভূমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে।

- বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ-সংরক্ষণ এবং বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় উপযুক্ত কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হবে। একই সঙ্গে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা হবে।

- প্রাণিসম্পদ-গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান কর্মসূচিকে বিস্তৃত করা হবে। এসব পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

- ছোট ও মাঝারি আকারের দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য চাষের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজনমতো ভর্তুকি, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নীতি-সহায়তা বৃদ্ধি করে তা অব্যাহত রাখা হবে।

- পুকুরে মাছ চাষ ও যেখানে সম্ভব ধানক্ষেতে মাছ চাষের আরও প্রসারের জন্য উন্নত জাতের পোনা, খাবার, রোগব্যাধির চিকিৎসা, পুঁজিসংস্থান ও সুলভে বিদ্যুৎ সংযোগসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখা হবে। মৎস্য খাতের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণার ব্যাপক মানোন্নয়ন, কৃষকদের সম্পৃক্ত করে মাছ চাষের ব্যবস্থাপনাগত উন্নতি সাধন ও ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

- সার্বিক কৃষি খাতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১৪.৩১ শতাংশ। এটাকে আরও বৃদ্ধি করা হবে।

৪.৩ 'আমার গ্রাম – আমার শহর' : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

- স্বাধীন দেশে জাতির পিতা সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার যুক্ত করেছিলেন। গ্রামকে আওয়ামী লীগ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে বরাবরই বিবেচনা করে এসেছে। বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদে বহুমাত্রিক তৎপরতা যেমন– শিক্ষা সম্প্রসারণ, কৃষি ও অকৃষি খাতে দক্ষ জনবল বাড়াতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, গ্রামাঞ্চলে আর্থিক সেবা খাতের পরিধি বিস্তার, কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, বিদ্যুতায়ন, গ্রামীণ অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি গ্রামোন্নয়ন প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি গ্রামীণ অর্থনীতির এই বিকাশ প্রক্রিয়ায় সহায়ক হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য এসেছে। কৃষিজ ও অকৃষিজ উভয় ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়েছে।

- উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সকল সুবিধাদি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গ্রামে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ আরও বাড়ানো ও নির্ভরযোগ্য করার লক্ষ্যে গ্রুপভিত্তিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট ও সৌরশক্তি প্যানেল বসানোর উৎসাহ ও সহায়তা দেওয়া হবে।

- গ্রাম পর্যায়ে কৃষিযন্ত্র সেবাকেন্দ্র, ওয়ার্কশপ স্থাপন করে যন্ত্রপাতি মেরামতসহ গ্রামীণ যান্ত্রিকায়ন সেবা সম্প্রসারণ করা হবে এবং এসবের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান করা হবে। অকৃষি খাতের এসব সেবার পাশাপাশি হাল্কা যন্ত্রপাতি তৈরি ও বাজারজাত করতে বেসরকারি খাতের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।

৪.৪ শিক্ষা

- শিক্ষার যথাযথ বিকাশ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষার প্রয়োগ দেশের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরসনে গতিবেগ সঞ্চারিত করবে। এজন্য শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ও তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

- সমদুয় প্রাথমিক শিক্ষা এক ও অভিন্ন ধারায় আনা হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষকতা পেশায় সর্বোচ্চ মেধাবী মানুষদের আকৃষ্ট করা হবে– এ লক্ষ্যে তাদের জন্য উচ্চতর বেতন কাঠামো, প্রশিক্ষণসহ সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী শিক্ষকের অনুপাত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে।

- সার্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক একটি অভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাসহ শিক্ষার সকল স্তরে গতিশীলতা সৃষ্টি করা হবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতোমধ্যে প্রণীত শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা পাঠক্রম সংস্কার চলছে। শিক্ষা পাঠক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে– শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞান আহরণ এবং দেশ ও জাতির অবিকৃত সত্য ইতিহাস জানার সুযোগ সৃষ্টি করা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় বীরদের ভূমিকা ও অবদান যথাযথভাবে তুলে ধরার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীদের মনে তাদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও জাতীয় গৌরববোধ জাগ্রত হয়।

- মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে উগ্র-সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী ধ্যান-ধারণা প্রচার ও জঙ্গিবাহিনী গড়ে তোলার আখড়া হিসেবে ব্যবহার করার ষড়যন্ত্র কঠোরভাবে বন্ধ করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে যথাযথ শিক্ষা পাঠক্রম প্রণয়ন করা হবে।

- প্রতিটি জেলা সদরে সরকারি স্কুলগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে।

- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহিত ও সহায়তা প্রদান করা হবে। এজন্য বাজেট বৃদ্ধি করা হবে। সকল জেলায় অন্তত একটি প্রাইভেট বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

- শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র 'কর্ম-কমিশন' গঠন করা হবে।

- নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা হবে। দরিদ্র ও দুর্বলতর জনগোষ্ঠীর সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ অবারিত করা হবে।

- শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস, দলীয়করণ ও সেশনজট মুক্ত করা হবে। এজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এর মূল দায়িত্ব অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক এবং শিক্ষকদের হাতে ন্যস্ত করা হবে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের একমাত্র মানদণ্ড হবে মেধা, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা।

৪.৫ স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ

- সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহাজোট সরকারের প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি পুনর্মূল্যায়ন করে যুগের চাহিদা অনুযায়ী নবায়ন করা হবে। এই নীতির আলোকে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করা হবে।

- জনগণের দোরগোড়ায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে সকলের কাছে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকারি ক্লিনিকগুলোতে পর্যাপ্ত ঔষধ ও চিকিৎসা সরমঞ্জামাদি সরবরাহ করা হবে। অভিজ্ঞ ডাক্তার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ান এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োজিত করে আদর্শ স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। হেল্‌থ ক্লিনিক উন্নতকরণ, এমপিওভুক্ত স্কুলে পার্ট টাইম চিকিৎসক নিয়োগ এবং উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্সে স্কুল হেল্‌থ ক্লিনিক চালু করা হবে।

- প্রতি হাজার জীবিত জন্মে শিশুমৃত্যুর হার ১৫ জনে নামিয়ে আনা হবে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাতকের মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার কমানো এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য সূচকে অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা রেখে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হবে। ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি ১ লাখে জীবিত জন্মে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর অনুপাত ৭০ জনে, প্রতিহাজারে জীবিত জন্মে পাঁচ বছরের নিম্নে মৃত্যুহার ২৫ জনে নামিয়ে আনা হবে। অসংক্রামক রোগের কারণে অপরিণত মৃত্যুর হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনা হবে।

- জনসংখ্যানীতি যুগোপযোগী করা হবে। ২০৩০ সাল নাগাদ সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যবীমা নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় পুষ্টি পরিষদকে আরও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

- পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে মাঠপর্যায়ের কর্মীদের নিযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা জোরদার করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অ্যাফিলিয়েশন অথরিটি হিসেবে গড়ে তোলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন, মেডিকেল শিক্ষার মানোন্নয়ন, যুগোপযোগী সিলেবাস, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে।

- মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঔষধনীতি যুগোপযোগী করা হবে। ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতর বা কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। দেশীয় শিল্প

রক্ষা এবং জনগণ যাতে স্বল্পমূল্যে ঔষধ পায় ঔষধনীতিতে তার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হবে। ওষুধ প্রশাসন ও ড্রাগ টেস্টিং কর্তৃপক্ষকে দক্ষ, আরও কর্মতৎপর ও দুর্নীতিমুক্ত করা হবে।

- ঔষধ শিল্প ও ঔষধের কাঁচামাল প্রস্তুতকারী অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া হবে। ডব্লিউটিও (WTO) অনুন্নত দেশের জন্য এপিআই শিল্পকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত বিবিধ রেয়াত দিয়েছে, যার সুফল গ্রহণের জন্য গৃহীত নীতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।

- আয়ুর্বেদিক, ইউনানি তথা ঐতিহ্যবাহী দেশজ এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের উদ্দেশে উচ্চশিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে বর্তমান বোর্ডকে কাউন্সিলে উন্নীতকরণ, কঠোরভাবে উৎপাদিত ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। উল্লিখিত তিন ব্যবস্থার বাইরে বিদেশি হার্বাল ওষুধ উৎপাদন, আমদানি, মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। ভেষজের চাহিদা পূরণে ব্যাপকভিত্তিতে ঔষধি বৃক্ষ রোপণ ও ভেষজ বাগান সৃজনে উৎসাহিত করা হবে।

- স্বাস্থ্যসেবায় সহায়ক জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আরও ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হবে। বিশেষ করে প্যারামেডিক, নার্সিং এবং ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

- আর্সেনিক সমস্যা সমাধান করে সবার জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি এবং প্রতি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

- এইচআইভি/এইডস, কুষ্ঠ, যক্ষ্মাসহ সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং রোগ নিরাময়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৪.৬ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

- জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুগান্তকারী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, গোটা উন্নয়নশীল বিশ্বের একমাত্র সরকারপ্রধান যিনি জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টিকে জাতীয় নিরাপত্তার সমার্থক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

- বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা ও আরও দ্রুত করা হবে। এ লক্ষ্যে তেল, গ্যাস, কয়লা, জলবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস ও জৈবশক্তি, বায়ুশক্তি ও সৌরশক্তিসহ জ্বালানির প্রতিটি উৎসের অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

আঞ্চলিক জ্বালানি নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। বেসরকারি খাতে বৃহৎ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া পুরনো বিদ্যুৎকেন্দ্র মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও ওভারহোলিংয়ের ব্যবস্থা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ২০২১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০০০০ মেগাওয়াট। কিন্তু শিল্পায়ন ও ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধির সক্ষমতার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা ২৪০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে। বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধির হার ৮-১০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষের সঙ্গে সংগতি রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণও সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে।

- তেল ও নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও আহরণের কাজে অগ্রাধিকার দেওয়ার গৃহীত নীতি ইতোমধ্যেই চমকপ্রদ সাফল্য বয়ে এনেছে। ইতোমধ্যে দেশে দুটি তেলক্ষেত্র ও দুটি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হয়েছে। নতুন নতুন কূপ খননের ফলে গ্যাস উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাফল্যের এই ধারাকে আরও বেগবান করা হবে। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। গ্যাস ও এলপিজি'র সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হবে। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করা হবে।

- নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া হবে। গ্রিড লাইনবিহীন এলাকায় সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজ চলমান। এর পরিধি ও ব্যবহার বাড়ানো হবে। সেচকাজে সোলার প্যানেল ব্যবহার করার কাজ এগিয়ে চলেছে।

- জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে কয়লানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন কয়লা ও অন্যান্য খনিজসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে দেওয়া হবে বিশেষ গুরুত্ব। কয়লা সম্পদের যথাযথ অর্থনৈতিক ব্যবহারের লক্ষ্য হবে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

- বিদেশ থেকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশী ভারত, ভুটান ও নেপালের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন-বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

- বিদেশি তেল-গ্যাস উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিম্নতম কূপ খনন ও উন্নয়নের সময় দেশের স্বার্থ সমুন্নত রেখে নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনা হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ, নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার, উত্তোলন এবং গ্যাসের যুক্তিসংগত ব্যবহার একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে নিশ্চিত করা হবে।

- ২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা হবে। ২০২৩ সালের মধ্যে ২৮০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ২৩০০০ সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ৫ লাখ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

- ইস্টার্ন রিফাইনারির জ্বালানি তেল পরিশোধন ক্ষমতা ১৫ লাখ মেট্রিক টন থেকে ৪৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হবে।

৪.৭ যোগাযোগ

- উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো দক্ষ ও নিরাপদ চলাচল ব্যবস্থা। এ জন্য প্রয়োজন সুনির্মিত, সুচারুভাবে পরিচালিত ও সংরক্ষিত অবকাঠামো ও পরিবহন ব্যবস্থা। সে-লক্ষ্যে সব ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

- ঢাকাকে ঘিরে একটি এলিভেটেড রিংরোড এবং ইস্টার্ন বাইপাস নির্মাণেরও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ৩৯.২৪ কিলোমিটার বিস্তৃত ঢাকা পূর্ব-পশ্চিম এলিভেটেড হাইওয়ে নির্মাণ করা হবে।

- জাতীয় মহাসড়কগুলো চার-লেনে উন্নীত করার চলমান কার্যক্রম দ্রুততার সহিত সমাপ্ত করা হবে। ঢাকা-সিলেটসহ অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কগুলো চার-লেনে উন্নীত করা হবে।

- সড়ক নেটওয়ার্কে গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা সদরকে সংযুক্ত করার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

- স্বল্প খরচে যাতায়াত ও রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়েকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং এজন্য রেললাইনের উন্নয়ন সাধন করা হবে, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সংহত ও গতিশীল করা হবে এবং নতুন লাইনও নির্মাণ করা হবে। স্বপ্নের মেট্রোরেল এমআরটি ৬ (উত্তরা-মতিঝিল)-এর নির্মাণকাজ ২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে আরও ৪টি মেট্রোরেল যথাক্রমে এমআরটি-১ (বিমানবন্দর-কমলাপুর ও নতুন বাজার-পূর্বাচল ডিপো), এমআরটি-২ (গাবতলী-কাঁচপুর সেতু), এমআরটি-৪ (কমলাপুর-নারায়ণগঞ্জ) ও এমআরটি-৫ (সাভার-ভাটারা) নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে এবং এক্সপ্রেস রেলওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে কক্সবাজারকে রেল যোগাযোগের মাধ্যমে সারাদেশের সাথে সংযুক্ত করা হবে। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে যাতে চট্টগ্রামে পৌঁছানো যায় সেজন্য বুলেট ট্রেন (দ্রুতগামী ট্রেন)

চালু করা হবে। ক্রমে বুলেট ট্রেন সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা এবং কলকাতা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। ভারতের সাথে রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলাহাটি ও চিলাহাটি বর্ডারের মধ্যে রেললাইন নির্মাণের কাজ দ্রুতই শুরু হবে।

- প্রতিটি ছোট-বড় নদী খনন করা হবে এবং নদীগুলো যেন সারাবছর নাব্য থাকে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিরাপদে স্বল্প খরচে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের জন্য নৌপথের উন্নয়ন ও নৌ-পরিবহনের আধুনিকায়ন এবং রাজধানীকে ঘিরে নাব্য ও প্রশস্ত নৌপথ নির্মাণ করা হবে।

- গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এবং চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরকে আধুনিকায়ন করে এশিয়ার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। স্থলবন্দর আধুনিকায়ন করা হবে।

- বাংলাদেশ বিমানকে বাণিজ্যিকভিত্তিতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। বেসরকারি বিমান পরিবহনকে আরও উৎসাহিত করা হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগস্থল হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে সর্বাধুনিক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ করা হবে। রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল বিমানবন্দরকে উন্নত করা হবে। ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দরে থার্ড টার্মিনাল নির্মাণ, নতুন রাডার স্থাপন ও জেট ফুয়েল সরবরাহ করার জন্য পাইপলাইন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হবে। কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠা করা হবে সুপিরিয়র বিমান অবতরণে সক্ষম দেশের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন বিমানবন্দর। বাগেরহাটে খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে আঞ্চলিক কানেকটিভিটি বাড়ানোর লক্ষ্যে সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করা হবে।

- এশীয় রেল ও জনপথের আওতায় পার্শ্ববর্তী ভারত, ভুটান, নেপাল, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন ও পাকিস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহের সাথে রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। ট্রান্স এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে, বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল এবং বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক জোটের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা হবে।

৪.৮ শিল্প-বাণিজ্য

- দ্রুত শিল্পায়ন ছাড়া কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক সুস্থিতি সম্ভব নয়। এ জন্য দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, পুঁজিবাজারের দ্রুত বিকাশ ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা হবে। তাছাড়া, প্রতিযোগিতামূলক

বাজার-ব্যবস্থা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, উদ্যোক্তা-শ্রেণিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এবং অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ প্রভৃতি নীতিমালা সংবলিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

- দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। সে-লক্ষ্যে উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সমজাতীয় উপকরণের শুল্ক-কর ও মূসকের ব্যবধান হ্রাস করে শুল্ক-কর নিরূপণ স্বচ্ছ ও উন্নয়নবান্ধব করা হবে। দেশে যেসব পণ্য উৎপাদনের সুযোগ আছে সেসব ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত প্রতিরক্ষণ দেওয়া হবে। শিল্প উন্নয়নের জন্য ট্যারিফ এনোমেলি দূর করা হবে।

- আইটি শিল্পের উন্নয়ন, পোশাক ও টেক্সটাইল খাতকে সম্প্রসারণ, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ওষুধ, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য, খেলনা, জুয়েলারি ও আসবাবপত্র শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাটের বিকল্প ব্যবহার ও পাট শিল্পকে লাভজনক করতে নেওয়া হবে বিশেষ উদ্যোগ।

- ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তা দান, তাঁত শিল্প রক্ষা ও রেশম, বেনারসি ও জামদানি পল্লি গড়ে তোলাসহ তাঁতি, কামার, কুমার ও মৃৎশিল্পীদের বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হবে। আখ চাষ ও চিনি শিল্পসহ কৃষিনির্ভর শিল্পকে উৎসাহিত করা, বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানিতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা দেওয়া হবে।

- পর্যটন খাতের বিকাশ এবং দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকৃষ্ট করা, তাদের আবাসন, চিত্তবিনোদন, সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা এবং ভ্রমণকে সহজসাধ্য ও আরামপ্রদ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

- জাতীয় উন্নয়নে বিশেষত শিল্পায়ন, অবকাঠামো নির্মাণ এবং বিভিন্ন সেবা খাতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতের যৌথ উদ্যোগ (পিপিপি) এবং বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। পিপিপি'র সাফল্যের জন্য পৃথক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ইতোমধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে এবং পিপিপি'র আওতায় নানা ধরনের প্রণোদনা ও সুযোগ দিয়ে শিল্প এলাকা, প্রযুক্তি পার্ক, কৃষি খামার, মাঝারি ও কুটির শিল্প ইত্যাদি গড়ে তোলা হবে।

- আশা করা যায়, বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে প্রায় ১ কোটি মানুষের। ২০২৩ সালের মধ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি (১০.০ শতাংশ) অর্জনের জন্য বেসরকারি ও সরকারি খাতে শিল্পায়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

- জ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।

- সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে রেলওয়ে বগি ও কোচ উৎপাদন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ তার ইতিবাচক ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করবে।

৪.৯ বৃহৎ প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট) বাস্তবায়ন

- দেশের উন্নয়নের চাকায় নতুন গতি সঞ্চারের জন্য বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রকল্পের প্রয়োজন হয়। অর্থনীতির ভাষায় যাকে 'সজোরে ধাক্কা' (বিগ পুশ) বলা হয়। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই ১০টি অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প ফাস্ট ট্র্যাকভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– স্বপ্নের পদ্মাসেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা দ্রুত গণপরিবহন (Mass Rapid Transit), এলএনজি ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট, মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু রেল সংযোগ এবং চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ১২৯.৫ কিমি রেললাইন স্থাপন। আওয়ামী লীগ এসব মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ ও ভূমিকা পালনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

৪.১০ বেসরকারি খাত ও বাজার-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

- উন্নয়নের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে বেসরকারি খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি খাত যাতে নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন, আয়বর্ধন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, সেজন্য আওয়ামী লীগ সবসময় নীতিগত সমর্থন ও পরামর্শ দিয়ে আসছে। বেসরকারি খাতের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার লাভের জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণদান, কর ও শুল্কনীতির প্রতি সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

- আওয়ামী লীগ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের পথে সকল প্রকার দীর্ঘসূত্রতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং লালফিতার দৌরাত্ম্যের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর। বিনিয়োগ পদ্ধতি সহজিকরণ এবং ওয়ানস্টপ সার্ভিস পদ্ধতি কার্যকর করার মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হবে।

- দেশের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী, বিশেষ করে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ ও উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ বাজার-ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন কাজ অব্যাহত থাকবে। সেই সঙ্গে বহির্বিশ্বের নতুন নতুন রপ্তানি বাজারেও আমাদের প্রবেশ করতে হবে। সে-লক্ষ্যে একদিকে যেমন আমাদের পণ্যের বহুমুখীকরণ, গুণগত মান ও নিয়মিত নির্ভরযোগ্য জোগানের নিশ্চয়তা বাড়াতে হবে, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন ও রীতিনীতি সম্পর্কেও জ্ঞান-দক্ষতা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য সম্প্রসারণমুখী নীতিমালার প্রতি সমর্থন দিয়ে যাবে এবং সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধনেও কাজ করে যাবে।

- বর্তমানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে জিডিপি'র পরিমাণ ৩০ শতাংশ। মূলধনের ঘাটতি, উপকরণের অপ্রতুলতা, অনগ্রসর প্রযুক্তি ও বাজারের অভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না। এসব বাধা দূর করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে গতিশীল করা হবে।

৪.১১ বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং আইসিটি

- একবিংশ শতাব্দীর এই সূচনাপর্বে বিজ্ঞান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানচর্চা, মৌলিক গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি এবং কৃতী গবেষকরা যাতে স্বদেশেই গবেষণাকর্ম ও বিজ্ঞানচর্চায় আকৃষ্ট হন সে-ব্যবস্থা করা হবে। সেই সাথে যেসব মেধাবী বাঙালি বিদেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে মৌলিক আবিষ্কার করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তারা যেন আমাদের দেশের বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ অর্থনীতি ও জ্ঞান জগতে অবদান রাখতে সক্ষম হন সে-উদ্যোগ নেওয়া হবে।

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তথ্যপ্রযুক্তির সুফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কুল পর্যায় থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

- পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারে রূপান্তর এবং সকল স্তরের শিক্ষা পদ্ধতিকে ডিজিটাল করা হবে। প্রাথমিক স্কুলের ৩০ শতাংশে এবং সকল মাধ্যমিক স্কুলের ১০০ শতাংশে আইসিটি ল্যাবরেটরি গড়ে তোলা হবে। কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলোতে নগরাঞ্চলের বিশেষজ্ঞদের সাথে টেলিপরামর্শ গ্রহণ সুবিধা ২৫ শতাংশ হারে গড়ে তোলা হবে।

- কম্পিউটারের সফটওয়্যার ও সেবা খাতের রপ্তানিসহ কম্পিউটারে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তির সফটওয়্যার, সেবা ও ডিজিটাল যন্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধির সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ঘটানো ও ইন্টারনেট সেবার মূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা হবে।

- ২০২১-২৩ সালের মধ্যে ফাইভ-জি চালু করা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন, আইটি-সহ ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো হবে। ই-পাসপোর্ট এবং ই-ভিসা চালু করা হবে। শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আর্থিক খাতের লেনদেনের ডিজিটাল নিরাপত্তা জোরদার করা হবে। আওয়ামী লীগ এ অভূতপূর্ব তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের সক্রিয় সাথী এবং এর উত্তরোত্তর সম্প্রসারণে দলীয়ভাবে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। বঙ্গবন্ধু-২ স্যাটেলাইট এবং সাবমেরিন ক্যাবল-৩ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। সামরিক বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ডিজিটাল সক্ষমতা বাড়ানো হবে।

- কালিয়াকৈর ও যশোরে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইসিটি ইনকিউবেটর এবং কম্পিউটার ভিলেজ স্থাপন করা হবে।

- সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তিসেবা খাতকে রপ্তানি সহায়তা প্রদান করা হবে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ এবং আগামী ২০২১ সালের মধ্যে অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাতে পরিণত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত উদ্যোগ নিশ্চিত করা হবে।

- আইসিটি শিল্পের জন্য ১ মিলিয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবসম্পদ তৈরিকরণ; গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য জিডিপি'র অন্তত ১ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

- শক্তিশালী সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ২০২৩ সালের মধ্যে অর্জিত হবে। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

- কপিরাইট আইনের সঠিক প্রয়োগ করা হবে এবং পেটেন্ট-ডিজাইন এবং ট্রেড মার্কস আইন যুগোপযোগী করে তা প্রয়োগ করা হবে।

- টেলি ঘনত্ব ১০০ শতাংশ, ইন্টারনেট বিস্তার ১০০ শতাংশ এবং ব্রডব্যান্ড বিস্তার ৫০ শতাংশে উন্নীত করা হবে।

- তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.১২ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা

- সুশাসন প্রতিষ্ঠাই হবে আওয়ামী লীগের অন্যতম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। সুশাসন ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক মুক্তি একেবারেই অসম্ভব। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ৪টি পূর্বশর্ত যার অন্যতম হচ্ছে দুর্নীতি দমন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এ বিষয়ে আমাদের কার্যক্রম ইতোমধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে। অন্য ৩টি শর্ত হচ্ছে– (ক) আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা বিধান (খ) রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র চর্চা নিরঙ্কুশ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা (গ) দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে জনহিতে নিবেদিত নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং একটি জবাবদিহিতামূলক, পেশাদারি ও দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা।

- ২০০১-০৬ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে ধারাবাহিকভাবে পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশ বিশ্বে এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে কলঙ্কিত হয়েছে। বিশেষ করে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরে প্রকাশিত রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালীদের অতীতের দুর্নীতির লোমহর্ষ কাহিনি জাতিকে লজ্জিত করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অতীতের দুর্নীতির কলঙ্কমোচন এবং একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ-দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনোপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, বিলখেলাপি, করখেলাপি ও দুর্নীতিবাজদের বিচার করে শাস্তি প্রদান এবং তাদের অবৈধ অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুশাসনেরও অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম দুর্নীতি দমন কমিশন সরকারি হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনকে জনগণের আস্থাভাজন একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে এর ভূমিকা আরও বৃদ্ধি করা হবে।

- সরকারি ক্রয়, প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ, টেন্ডার এবং সম্পন্ন প্রকল্পের মান যাচাইয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই ধারা সংহত ও অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনকে আরও শক্তিশালী ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা হবে। ইতোমধ্যে এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে ভূমি প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, আদালত, শিক্ষাঙ্গন ও স্বাস্থ্যসেবায় স্বচ্ছতা এনে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি প্রশমনের যে ধারা সূচিত হয়েছে, তাকে আরও বেগবান করা হবে।

- টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা তার নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে ঘোষিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনা করছেন, যা ইতোমধ্যেই জনগণের প্রশংসা কুড়িয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনি-ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ জোরদার করা হবে।

- খেলাপি সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ বারংবার পুনঃতফসিলিকরণের সুযোগ রহিত এবং রুগ্‌ণ শিল্পকে গুটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ব্যাংকের লেনদেন বা জনশক্তি নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা হবে। প্রকল্প মূল্যায়ন ও ঋণ পর্যবেক্ষণকে আরও বস্তুনিষ্ঠ ও উন্নত করা হবে।

- আমাদানি-রপ্তানিতে আন্ডার ইনভয়েজ, ওভার ইনভয়েজ, শুল্ক ফাঁকি, বিদেশে অর্থপাচার, হুন্ডি, সিন্ডিকেট করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে অতি মুনাফা প্রভৃতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.১৩ সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

- আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অর্জিত উন্নয়নের পথে এখন সবচেয়ে বড় বাধা জনজীবনের নিরাপত্তাবিনাশী বিএনপি-জামাত জোটের ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছে বিএনপি-জামাত চক্র। আন্দোলনের নামে তারা অরাজকতা, পুড়িয়ে মানুষ হত্যাসহ শান্তিবিনাশী সকল অপকর্মের ইন্ধন জোগাচ্ছে। আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট অবস্থান এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আইনি পন্থায় যে কোনো ধরনের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ জন্য দেশব্যাপী জঙ্গিবিরোধী প্রতিবাদ, তৎপরতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তা সকল মত ও পেশার শান্তিকামী মানুষকে একতাবদ্ধ করেছে। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা, জনগণের নিরাপত্তা এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার এ কঠিন চ্যালেঞ্জ দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করা হবে।

- বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবিরোধী কার্যক্রম বিশ্বসম্প্রদায়ের প্রশংসা পেয়েছে। আওয়ামী লীগ শেখ হাসিনার ইস্পাত কঠোর অবস্থানের প্রতি জোর সমর্থন দিয়ে তার হাতকে আরও শক্তিশালী করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

- রাষ্ট্র পরিচালনায় সংবিধানের প্রাধান্য, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠন সুনিশ্চিত করা হবে। জাতীয় সমস্যা হিসেবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে

আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নে গ্রহণ করা হবে সর্বাত্মক পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ এবং জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বন্ধে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে সম্প্রতি যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে।

- ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশে গ্রেনেড হামলা মামলার বিচারিক আদালতের রায় দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এছাড়া জোট সরকারের আমলে সংঘটিত সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড– প্রায় ৬০০ স্পটে বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ, গ্রেনেড হামলা– সুষ্ঠুভাবে তদন্ত ও দেশের প্রচলিত আইনে বিচার শুরু হয়েছে। নির্বিঘ্নে বিচার সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হবে।

- অবৈধ অস্ত্র আমদানি, অস্ত্র চোরাচালান, বেচাকেনা ও ব্যবহার কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

- পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, আনসার ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করা এবং তাদের চাকরির নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে আধুনিকীকরণ করার ধারা অব্যাহত রাখা হবে। তাদের নিযুক্তি, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি এবং পদায়নকে রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে রাখা হবে।

- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় কার্যকর করা হয়েছে। বিদেশে পলাতক অবশিষ্ট আসামিদের দেশে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

- বর্তমানে বিচার বিভাগ এবং জুডিসিয়াল সার্ভিসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রাখা হবে।

- বিচার বিলম্বিত হওয়ার দুষ্টচক্র থেকে বিচার বিভাগকে মুক্ত এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইনের সংস্কারের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আইন সংস্কার কমিশন'কে কার্যকর করা হয়েছে। নিম্ন থেকে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে। সমুদয় আদালতের কর্মকাণ্ড ডিজিটালাইজড করা হবে।

- মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

৪.১৪ গণতন্ত্র ও কার্যকর সংসদ এবং গণমুখী দক্ষ জনপ্রশাসন

- সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রাষ্ট্র পরিচালনার অন্তরায়সমূহ দূর করেছে। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ ও কার্যকারিতার ক্রমাগত বৃদ্ধি বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত ও পরীক্ষিত সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হবে আওয়ামী লীগের ব্রত। নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির চলমান সংস্কার প্রক্রিয়া আওয়ামী লীগ অব্যাহত রাখবে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা এবং জনগণের ভোটাধিকার ও নির্ভয়ে নিজের পছন্দমতো প্রার্থীকে ভোট প্রদান এবং নির্বাচনের ফলাফলে তাদের মতামতের প্রকৃত প্রতিফলনের ব্যবস্থাকে অলঙ্ঘনীয় করে তোলা হবে। ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রণীত আইনের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

- জাতীয় সংসদই হবে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। সংসদে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। সংসদীয় কমিটিগুলোর সক্রিয়তা বৃদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ও নজরদারিকে ফলপ্রসূ এবং আরও কার্যকর করা হবে।

- সকল ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব ধর্ম পালন করতে পারবে। রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার করা যাবে না এবং কোনো উপাসনালয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আলোচনা চলবে না। কোনো ধর্ম, সম্প্রদায় ও নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কখনও কোনো অবস্থান নেওয়া যাবে না। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা প্রতিহত এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

- প্রজাতন্ত্রের কর্মবৃত্তে নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির মাপকাঠি হবে জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং জনগণ ও সংবিধানের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য। এজন্য জনপ্রশাসন সংস্কারসহ প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর করা হবে।

- সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান, বিসিএস বা অন্যান্য পরীক্ষাসমূহে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ এবং ফলাফল বা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি ইতোমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে সদস্য নিয়োগ করা এবং ক্যাডারের পরিসর যুগোপযোগী করা হবে। এই নীতি দৃঢ়ভাবে অব্যাহত রাখা হবে।

- একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ দুর্নীতিমুক্ত দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যে প্রশাসনের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স চালু করার উদ্যোগ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। নিশ্চিত করা হবে প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সেবাপরায়ণতা।

- সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উন্নত কাজের পরিবেশ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সৎভাবে সম্মানজনক জীবন ধারণের জন্য মূল্যস্ফীতির নিরিখে বেতন/ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পুনর্নির্ধারণের জন্য স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করা হবে।

৪.১৫ জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ ও পানিসম্পদ

- জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা, দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পানিসম্পদ রক্ষায় ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক যে সকল সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

- উৎপাদনশীল বনের আয়তন ২০১৯ সালের ১৫.৫৮ শতাংশ থেকে ২০২৩ সাল নাগাদ ২০ শতাংশে উন্নীতকরণ; ঢাকা ও অন্যান্য বড় নগরগুলোতে বায়ুর মান উন্নয়ন এবং বিশুদ্ধ বায়ু আইন প্রণয়ন; শিল্প বর্জ্যের শূন্য নির্গমন/নিক্ষেপণ প্রবর্ধন করা; জলাভূমি সংরক্ষণ আইন মেনে বিভিন্ন নগরের জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা করা; উপকূলরেখাব্যাপী ৫০০ মিটার চওড়া স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে; টেকসই ভূমি/পানি ব্যবহারের জন্য ভূমি অঞ্চল চিহ্নিতকরণ (জোনিং) সম্পন্ন করা; বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হ্রাস সমন্বয় সাধন করার প্রতি জোর প্রদান করা হবে।

- নদীর নাব্য রক্ষা, নৌ পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণ, পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা, নদী ভাঙন রোধ ও নদী শাসন কার্যকর করা, নদীর পাড় সংরক্ষণ এসব বিষয় নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট নদীপথের ক্যাপিটাল এবং রুটিন ড্রেজিংয়ের জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনার আওতায় গৃহীত কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে। ভূ-উপরিস্থিত পানির যুক্তিসংগত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

- সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বন সংরক্ষণে অগ্রাধিকারসহ দেশের বনসম্পদ রক্ষা, বন সৃজন, বন্যপ্রাণী ও অতিথি পাখিসহ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও লবণাক্ততা রোধ ও সুন্দরবনসহ অববাহিকা অঞ্চলের মিঠা পানি প্রাপ্তি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

- দেশের বিস্তীর্ণ হাওর ও ভাটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

- ঢাকা মহানগরসহ দেশের অন্যান্য মহানগর ও শিল্পাঞ্চলসমূহে দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে যথাযথ পরিকল্পনা নেওয়া হবে। পানি ও বায়ুদূষণ রোধ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে।

- সর্বক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখা হবে। গঙ্গার পানিচুক্তির অনুরূপ অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের লক্ষ্যে ভারতের সঙ্গে পানিবণ্টন চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। নেপাল ও ভারতের সঙ্গে সপ্তকোষী প্রকল্পে বাংলাদেশের ন্যায্য অংশীদারিত্ব অর্জনের চেষ্টা করা হবে।

- পরিবেশ ও পানিসম্পদ রক্ষায় কার্যকর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা হবে।

৪.১৬ নারীর ক্ষমতায়ন-লিঙ্গ সমতা, আয়বৈষম্য ও সামাজিক সুরক্ষা

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংবিধানের ১০ ও ২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ' এবং রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। সে-লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতাকরণ, অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, সর্বোপরি নারীর উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

- উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানের ৭০ শতাংশ থেকে ২০২৩ সাল নাগাদ ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণ; ২০-২৪ বছর বয়সী শিক্ষিত নারী-পুরুষের অনুপাত বর্তমানের ৮৬ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে বৃদ্ধি করা হবে।

- আয়বৈষম্য হ্রাস করাসহ জিডিপি'র অংশ হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা ব্যয় কমপক্ষে জিডিপি'র ২.৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে। সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর আওতায় অধিক সংখ্যক নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত ও পর্যায়ক্রমে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়ও নারীর কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

- প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনীসমূহ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

- কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা, কর্মবান্ধব পরিবেশ, মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হবে। কর্মজীবী মহিলাদের জন্য বিভিন্ন জেলা সদরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হোস্টেল নির্মাণ করা হবে।

- নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ধর্মের অপব্যবহারের মাধ্যমে নারী নির্যাতন ও সহিংস কার্যকলাপ বন্ধ করা হবে।

- নারী ও শিশুপাচার রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- 'জয়িতা' ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারীদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ সম্প্রসারণ করা হবে।

- নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা, কারিগরি সুবিধা ও সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

৪.১৭ শিশু-কিশোর কল্যাণ

- শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাযথ শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পুষ্টি, শিক্ষা ও বিনোদনের উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

- শিশু নির্যাতন বিশেষ করে কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধ এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশুসদন প্রতিষ্ঠা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, মর্যাদা ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা হবে।

- সুদৃঢ় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলে পর্যায়ক্রমে সর্বক্ষেত্রে শিশুশ্রম বন্ধ করা হবে। শিশু-কিশোরদের প্রলোভন বা জোর করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.১৮ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চল

- দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে হিংস্র আক্রমণ ও বৈষম্যের শিকার হয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ে। জোট

সরকারের এথনিক ক্লিনজিং-এর কবলে পড়ে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও নৃ-জাতি গোষ্ঠীর অসংখ্য নর-নারী নিহত হয়েছে; অসংখ্য নারী হয়েছে ধর্ষণের শিকার, তাদের ঘরবাড়ি, জমি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দখল ও লুণ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও চা-বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। পাহাড়ি ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনী অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ইতোমধ্যে ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে। সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

- ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি আইন সংশোধন এবং এই আইনের অধীনে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।

- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চুক্তির বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে। ক্ষমতায়নের এই ধারা চুক্তির শর্তানুযায়ী অব্যাহত থাকবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

- জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে।

- বস্তি, চর, হাওর, বাঁওড় ও উপকূলসহ দেশের সকল অনগ্রসর অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন এবং ওইসব অঞ্চলের জনগণের জীবনের মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৪.১৯ তরুণ যুবসমাজ : 'তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'

- বাংলাদেশ এক গর্বিত ও সাহসী তারুণ্যের দেশ। বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে আমাদের তরুণ সমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। এদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশের বয়স ৩০-এর নিচে। তার মধ্যে ১৫-২৯ বছর বয়সী তরুণের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি।

- একবিংশ শতাব্দীর প্রথম লগ্নে এদেশের পুনর্গঠনে এই তরুণদের শ্রম, মেধা এবং প্রাণশক্তির যথাযথ ব্যবহারই পারে দেশের চেহারা পাল্টে দিতে। এ জন্য বিশ্বায়নের যুগের এই তরুণ-তরুণীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের স্বপ্ন-কল্পনা এবং জীবনধারাকে বুঝতে হবে। সকল বয়সী তরুণ-তরুণীদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশে শিক্ষার সুযোগ অবারিত করা এবং তাদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হবে বহুমুখী কর্মসূচি।

- সকল কর্মক্ষম নাগরিকের নিবন্ধন করা হবে এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে। ১০০ দিনের জন্য কর্মসংস্থানের যে স্কিম গ্রহণ করা হয়েছে তাকে অবলম্বন করে প্রত্যেক পরিবারের জন্য একজন কর্মক্ষম যুবককে কর্মসংস্থানের জন্য 'এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম' পর্যায়ক্রমে কার্যকরী করা হবে। ২০২১ সালে এই স্কিমের আওতায় সকল পরিবার সুযোগ পাবে।

- হতাশা, মাদকাসক্তি ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত হওয়া থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করে দেশের পুনর্গঠনে ও সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণে তাদের উৎসাহিত করা হবে। নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত তরুণ-তরুণীসহ যুবসমাজের জন্য বিশেষ কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ ও বাণিজ্যিক ঋণের ব্যবস্থা করে তরুণ উদ্যোক্তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনমূলক বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে।

- যুবসমাজকে রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা এবং তাদের বিপথগামী করার সর্বনাশা খেলা বন্ধ করা হবে। শিক্ষিত ও প্রতিভাবান তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম, আদর্শবাদ, সততা ও সাংগঠনিক গুণাবলির বিকাশের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব হিসেবে তাদের গড়ে তোলা হবে। এছাড়া বিজ্ঞানচর্চা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-খেলাধুলা প্রভৃতি সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমেও তারুণ্যের শক্তিকে দেশ গঠনের কাজে অবদান রাখার প্রয়োজনীয় সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

- উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমুদয় যুবসমাজকে দুই বছরের জন্য 'ন্যাশনাল সার্ভিস'-এ নিযুক্ত করা হবে। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে ৩৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলা ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এই কর্মসূচি সারাদেশে সম্প্রসারণ করা হবে।

- যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৬টি উপজেলায় যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সাবলম্বীকরণ, যুব ঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

- একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে 'জাতীয় যুবনীতি-২০১৭' পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে। তরুণদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য যুব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'যুব গবেষণা কেন্দ্র' গঠন করা হবে।

- বেকারত্বের হার ২০২৩ সালে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। ২০২৩ সালের মধ্যে কর্মসংস্থানে কৃষি, শিল্প ও সেবার অংশ যথাক্রমে ৩০, ২৫ ও ৪৫ শতাংশে পরিবর্তন করা। 'লেবার ফোর্স সার্ভে-২০১৩' অনুসারে কর্মসংস্থানে কৃষি, শিল্প ও সেবার অংশ যথাক্রমে ৪৫.১, ২০.৮ ও ৩৪.১ শতাংশ। ২০২৩ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ১৫ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ে নতুনভাবে ৯.৯ মিলিয়ন মানুষ শ্রমশক্তিতে যুক্ত হবে। এ বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

৪.২০ শ্রমনীতি

- দেশের দ্রুত শিল্পায়ন এবং আধুনিক সভ্যতা নির্মাণে শ্রম ও শ্রমিক-শ্রেণির সংগঠিত ভূমিকা রক্ত সঞ্চালকের। একই সঙ্গে মালিক-শ্রমিক এবং শ্রম ও মজুরির সম্পর্ক শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার পূর্বশর্ত। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীদের সংগঠিত শ্রমিক শক্তির অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিতে হবে। জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তা, চাকরির নিরাপত্তা এবং শ্রমিক কল্যাণ ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের স্বীকৃতি, সর্বোপরি শ্রমিক-মালিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অপরিহার্য। শ্রম আইন ও নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য দূর করা হবে।

- বাজার ব্যবস্থার কাঠামোর সঙ্গে জনকল্যাণের সমন্বয় ঘটানো হবে। মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়কে বিবেচনায় রেখে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করা হবে। নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য দূর, শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে। দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় ট্রেডভিত্তিক ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

- পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধান, শ্রমিক মালিক ও সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দেওয়া হবে। পোশাক শিল্পে পরিকল্পিত অন্তর্ঘাত এবং গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে উপর্যুপরি দুর্ঘটনা ও

প্রাণহানি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও শিল্প শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষাসহ হতদরিদ্র ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য বিশেষ বিবেচনায় রেশনিং প্রথাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.২১ সংস্কৃতি ও ক্রীড়া

- বাঙালি সংস্কৃতির সুমহান ঐতিহ্য ধারণ, বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন রচনা করে স্বকীয় জাতীয় সংস্কৃতির সৃজনশীল বিকাশ এবং লোক-সংস্কৃতি ও লোক-ঐতিহ্য সংরক্ষণে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে। দেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনধারার বৈশিষ্ট্যসমূহ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

- দেশের সর্বত্র সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ সৃষ্টির জন্য নাট্যশালা, মিলনায়তন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, শিশু একাডেমি, নজরুল একাডেমি, জাদুঘর, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণমুক্ত রাখা এবং প্রকৃত জ্ঞানী-গুণী ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পারদর্শী বিশিষ্টজনকে দিয়ে পরিচালনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সহায়তা বৃদ্ধি করা হবে। দেশের সর্বত্র গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে।

- বাঙালি সংস্কৃতি, লোক-ঐতিহ্য, মেলা, যাত্রাপালা, নাটক, চলচ্চিত্র, নাচ-গান, সার্কাসসহ সুস্থ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি এবং জঙ্গিদের হামলা ও অপপ্রচার নির্মূল করা হবে। সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, কূপমণ্ডূকতা এবং কুসংস্কার প্রতিরোধের পাশাপাশি অশ্লীলতা ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও জনগণকে বিজ্ঞানমনস্ক এবং উদার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

- কোরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না। সকল ধর্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

- বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য পুনঃআবিষ্কার, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, গবেষণা এবং প্রত্নতত্ত্বসমূহ সংরক্ষণ এবং সারাবিশ্বের পর্যটক আকর্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। দেশের পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রদর্শনের জন্য দেশের প্রত্যেক প্রত্নস্থানে জাদুঘর গড়ে তোলা হবে।

- ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন বিশেষ করে ক্রিকেটে প্রথমসারির যোগ্যতা অর্জন এবং ফুটবলসহ অন্যান্য খেলায় আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হবে। ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু, কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থাকে শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ করা হবে।

৪.২২ মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা

- মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় ও স্বাধীন সার্বভৌম জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী ত্রিশ লক্ষ শহিদ এবং দেশের কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, শোষণ ও ভেদ-বৈষম্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের শহিদ ও দেশবাসীর এই স্বপ্ন রূপায়ণে বদ্ধপরিকর। স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিস্বরূপ, বিশেষত দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, বার্ধক্যকালীন ভরণ-পোষণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা অব্যাহত থাকবে। সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবসরকালীন বয়স ৫৭ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। ষাট ও তদূর্ধ্ব বয়সের সকল মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে রেল, বাস ও লঞ্চে বিনামূল্যে চলাচলের সুযোগ দেওয়া হবে।

- সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় স্তম্ভ মূল নকশা অনুযায়ী নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং স্মৃতি জাদুঘর, শিখা চিরন্তন এবং স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। দেশের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষা, ইতিহাস বিকৃতি রোধ এবং প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, বিশেষত কওমী, এবতেদায়ী ও অন্যান্য মাদ্রাসায়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এখন পর্যন্ত পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, অবিলম্বে তা করা হবে এবং পাঠদান নিশ্চিত করা হবে। সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন বধ্যভূমি ও গণকবর চিহ্নিতকরণ, শহিদদের নাম-পরিচয় সংগ্রহ এবং স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে।

৪.২৩ সরকার ও এনজিও

- গত প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে দেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের

ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা অভিযানে এবং স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে এনজিওদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

- এনজিওদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনমূলক তৎপরতা আমরা সমর্থন করি এবং সেজন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ উদ্যোগ নেবে। এ প্রেক্ষিতে ও লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে–

  * বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বশাসিতভাবে তাদের নিজস্ব বিধিমোতাবেক পরিচালিত হবে। বিধিবদ্ধ এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না। তাদের অর্জন বা ব্যর্থতা মূল্যায়নে সরকার নজর দেবে।

  * সরকারি প্রতিষ্ঠান/বিভাগের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছামূলক সমন্বয় জোরদার করা হবে।

  * এনজিও এবং ক্ষুদ্র ঋণদাতা সংস্থাগুলোর সকল কার্যক্রম ও আয়-ব্যয়ের হিসাবের স্বচ্ছতা নিরূপণ এবং স্থানীয় জনগণ ও সরকারি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

- এনজিও সংস্থা কর্তৃক শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ কার্যক্রম দেশের প্রচলিত আইনের বিধিবিধান মোতাবেক নির্ধারিত হবে। এজন্য তারা বিশেষ কোনো সুবিধা পাবে না। শুধুমাত্র তাদের লভ্যাংশের যে অংশ জনসেবায় ব্যয় হবে সেক্ষেত্রে কর রেয়াতির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪.২৪ স্থানীয় সরকার

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণের রাষ্ট্র পরিচালনায় তৃণমূল পর্যায় থেকে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদসহ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে শক্তিশালী করা হবে, দেওয়া হবে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব।
- কেন্দ্রীয় বাজেটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকারের জন্য বাজেট প্রণয়ন এবং সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে–

  * কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন কাজ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে অর্পণ করা যায়, তা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং এসব কাজ পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে অর্পণ করা হবে।

  * জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন সুনির্দিষ্ট করা হবে।

* বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে গড়ে উঠেছে। এই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সাথে সাথে প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়েও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপযোগী বিশেষায়িত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সৃষ্টি এবং তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রাজস্ব বিভাজনের একটি ন্যায্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

* পরিকল্পিত পল্লি জনপদ এবং উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলোকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৪.২৫ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ

- বিএনপি-জামাত জোট সরকার কর্তৃক গণমাধ্যম দলীয়করণ এবং গোষ্ঠীবিশেষের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের পরিপন্থী ছিল। রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে একতরফা দলীয় প্রচার বন্ধ এবং রাজনৈতিক কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারী শিল্পী-কলাকুশলীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান করা হবে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার ধারা অব্যাহত থাকবে।

- ইতোমধ্যে অনেকগুলো নতুন বেসরকারি টিভি চ্যানেল, এফএম রেডিও ছাড়াও স্থানীয়ভিত্তিক কমিউনিটি রেডিও চালু হয়েছে। সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্যপ্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা হবে।

- সকল সাংবাদিক হত্যার দ্রুত বিচার করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং সাংবাদিক নির্যাতন, তাদের প্রতি ভয়-ভীতি-হুমকি প্রদর্শন এবং সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে।

- সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বিতরণে বৈষম্যমূলক নীতি, দলীয়করণ বন্ধ এবং সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে বিবেচনা করে তার বিকাশে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৪.২৬ প্রতিরক্ষা

- মহান মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা জনসাধারণের আস্থা অর্জন করেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে তাদের

ভূমিকা দেশের প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার সশস্ত্র বাহিনীকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে একটি দেশপ্রেমিক, সাহসী, দক্ষ ও অজেয় প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

- দেশের প্রতিরক্ষা-সামর্থ্য/শক্তি অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিজিবি'র জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে গড়ে তোলার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা অব্যাহত রাখা হবে। সশস্ত্র বাহিনীর সকল শ্রেণির সদস্যদের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রকল্প ছাড়াও নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার ১৯৭৪ সালে একটি প্রতিরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করে, তারই আলোকে ২০৩০ আওয়ামী লীগ সরকার ফোর্সেস গোল প্রণয়ন করেছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা, মেধা, দক্ষতা ও জ্যেষ্ঠতার নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সংবিধানসম্মতভাবে প্রয়োজনীয় স্বশাসনের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। স্বশস্ত্র বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের পেশাগত দক্ষতা এবং তাদের চাকরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

- আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীসহ আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় অধিকতর অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহ যাতে জাতি গঠন এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অধিকতর অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে।

৪.২৭ পররাষ্ট্রনীতি

- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হিসেবে বঙ্গবন্ধু প্রণীত নীতিমালা তথা 'দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়' অব্যাহত থাকবে।

- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন ইস্যুতে মতপার্থক্য দূর করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে; দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় রেখে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। বাংলাদেশের মাটিতে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্র, অন্যান্য দেশের ইনসার্জেন্সি গ্রুপ এবং আন্তর্জাতিক অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানিরা যাতে ঠাঁই না পায়, তা সুনিশ্চিত করা হবে। নারী ও শিশুপাচার প্রতিরোধে যৌথ উদ্যোগ জোরদার করা হবে।

- বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকার তার বৈদেশিক নীতি ও জঙ্গিবাদের প্রতি সরাসরি মদতদানসহ অভ্যন্তরীণ নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যেভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন ও দেশকে বন্ধুহীন করেছে, সে-অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সুনাম ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

- ভারতের সঙ্গে গঙ্গাচুক্তির অনুরূপ অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ নদী কমিশনকে কার্যকর করা এবং সীমান্তে শান্তি নিশ্চিত করার ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্যোগ আরও জোরদার করা হবে।

- আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে–
  * সার্ক, বিমসটেক ও ডি-৮ ভুক্ত দেশগুলোসহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও যোগাযোগের প্রসার;
  * বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ;
  * পরিবেশ, পানি ও বনজসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমারের সাথে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ;
  * পর্যটনের ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ ও সহযোগিতা বাড়ানো;
  * প্রাকৃতিক ও জলবায়ুর পরিবর্তনপ্রসূত দুর্যোগ মোকাবিলায় আঞ্চলিক উদ্যোগ ও প্রস্তুতি, সচেতনতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং
  * শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও বিশেষ দক্ষতার সুষম বিভাজন।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও কানাডাসহ উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার ও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা

হবে। রাশিয়া, চীন এবং আশিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা হবে। বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার সঙ্গে অধিকতর যোগাযোগ ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হবে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে ফলপ্রসূ সম্পর্ক স্থাপনে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

- সৌদি আরব, মিসর, প্যালেস্টাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ এবং তুরস্ক, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াসহ বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক এবং উন্নয়ন ও সহযোগিতার ক্ষেত্র জোরদার করা হবে। মুসলিম উম্মাহর সংহতি এবং ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) কাঠামোয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সহযোগিতা জোরদার করা হবে।

- জাতিসংঘের শান্তি মিশনে অধিকতর অংশগ্রহণসহ এর অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সক্রিয় ভূমিকা বাড়ানো হবে। কমনওয়েলথ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সংস্থাকে ফলপ্রসূ করার উদ্যোগ জোরদার করা হবে।

৪.২৮ রোহিঙ্গা সংকট

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করার কারণে ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। শরণার্থী বহন করার জন্য অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণহত্যা ও জাতিগত নিধন থেকে সর্বস্ব হারিয়ে প্রাণ নিয়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সরকার রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিশুদের পরিচর্যা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। সরকারের তৎপরতার ফলে বিভিন্ন দেশ এবং জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা রোহিঙ্গাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে এবং তাদের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও টেকসই সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন বন্ধু-রাষ্ট্র ও জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে গঠনমূলকভাবে আলোচনার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে পাঁচ-দফা এবং ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে চার-দফা প্রস্তাব পেশ করেছেন। রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমে নিরাপদ সম্মানজনক ও স্থায়ীভাবে ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে মিয়ানমারের সাথে সফলভাবে প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন করেছে।

৪.২৯ ব্লু-ইকোনমি তথা সমুদ্রসম্পদভিত্তিক উন্নয়ন

শেখ হাসিনার কূটনৈতিক সাফল্যের সুবর্ণ ফসল মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি। এর ফলে মিয়ানমারের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরের ২০০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে সমুদয় অর্থনৈতিক অঞ্চল ও তার বাইরে মহাদেশীয় বেষ্টনি এবং একইভাবে ভারতের সঙ্গে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহাদেশীয় বেষ্টনির মধ্যে সকল প্রকার সম্পদের ওপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমুদ্র খাত, যা ব্লু-ইকোনমি নামে অভিহিত, বাংলাদেশের উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সমুদ্রবন্দর, জাহাজ নির্মাণ, নৌ চলাচল, সাগরে মৎস্য চাষ, জলজ উদ্ভিদ, তেল, গ্যাস, খনিজসম্পদ আহরণ, সমুদ্রে জেগে ওঠা নতুন চর, সামুদ্রিক পর্যটন শিল্প ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্রসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন সুবিস্তৃত ও সুসংহত করার উদ্যোগকে দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

৪.৩০ এমডিজি অর্জন এবং এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন) বাস্তবায়ন কৌশল (২০১৬-৩০)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০০১-১৫) বাস্তবায়নের প্রস্তুতি শুরু করেছিল। ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় যাওয়ার পরে এমডিজি কর্মসূচি স্থবির হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পর এমডিজি কার্যক্রমে গতি সঞ্চার হয়। দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল, নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন– এ ৪টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ বিশেষ সাফল্য অর্জন করে বিশ্বে 'রোল মডেল' হিসেবে প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা হতে পুরস্কার লাভ করেছে। অন্য ৪টি লক্ষ্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, এইডস-ম্যালেরিয়া-অন্যান্য রোগব্যাধি দমন, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা, সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন পর্বের শেষে জাতিসংঘ ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর-পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি) গ্রহণ করে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। এই ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে।

টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়েছে, যথা– উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা (ইমপিমেন্টেশন অ্যান্ড রিভিউ)

কমিটি গঠন; প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্টকরণ; বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন; টেকসই উন্নয়নে অর্থসংস্থান কৌশল (SDGs Financing Strategy) প্রণয়ন; ২০১৭ সালে জাতিসংঘে স্বেচ্ছাভিত্তিক জাতীয় পর্যালোচনা প্রতিবেদন উপস্থাপন; সকল পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করা (Whole Society Approach) এনজিও, সিভিল সোসাইটি, সাংবাদিক, ক্রীড়াবিদ, যুবসমাজ ও উন্নয়ন সহযোগী যার অন্তর্ভুক্ত।

৪.৩১ ব-দ্বীপ বা ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ রয়েছে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে। জলবায়ুর ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' শতবর্ষের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে নেদারল্যান্ডস ও বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞদের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১৮ সালে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

পরিবেশের সাথে অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়ন ফলাফলের ওপর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা নীতিতে আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ঝুঁকির মধ্যে উচ্চতর ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং ব-দ্বীপ সম্পর্কিত অন্যান্য অভিযোজন তথা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনাটি ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করতে সহায়ক হবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সাল নাগাদ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয়ের যোগসূত্র সৃষ্টি করবে।

৫. মুজিববর্ষ উদযাপন

২০২০ সালের ১৭ মার্চ বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী। এ উপলক্ষে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন থেকে শুরু করে পুরো বছরজুড়ে সকল স্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে নানা বৈচিত্র্যময় কর্মসূচির মাধ্যমে বহুল কাঙ্ক্ষিত 'মুজিববর্ষ' পালন করা হবে। এই মহান জাতীয় উদ্যোগে আওয়ামী লীগ শহর-নগর-গ্রামগঞ্জ সর্বত্র উৎসবমুখর পরিবেশে আপামর জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে, আগামী দিনের শক্তি আমাদের তরুণ সমাজের প্রতি আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাই, তারা যেন দেশপ্রেম ও সুদৃঢ় ঐক্যের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা-সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার কালজয়ী আদর্শ ও কর্মকাণ্ডের ওপর গঠনমূলক আলোচনা, তথ্যভিত্তিক চর্চা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মুজিববর্ষ পালনে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর জীবনধর্মী সংস্কৃতি চর্চা, যাত্রা, নাটক, পালাগান ইত্যাদির ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করছে। এছাড়াও গ্রাম-গঞ্জের বিভিন্ন বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যে থাকবে বঙ্গবন্ধুর চির তারুণ্যদীপ্ত প্রিয় খেলাধুলা, ঘোড়দৌড় ও নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও নিদর্শনসমূহ ঘিরে চলবে নানামুখী আয়োজন ও উৎসব। বঙ্গবন্ধু কল-কারখানা, ক্ষেত-খামার সর্বত্র উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাই গ্রামীণ জনপদ থেকে শহুরে সমাজে সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান মনস্কতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজন করা হবে আধুনিক প্রযুক্তিমেলা। এ ব্যাপারে তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবর্ষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ মার্চ 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই ভাবনা থেকে মুজিববর্ষের শিশু দিবসের সকল আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু। আয়োজন করা হবে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি যেমন– মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং সাহিত্যের পাঠ ও পঠন, চিত্রাঙ্কন, শিশুনাট্য, খেলাধুলা প্রভৃতি।

বঙ্গবন্ধু আজীবন সম-অধিকার ও ন্যায়বিচারভিত্তিক দুর্নীতি ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। আওয়ামী লীগ সরকারও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে। মুজিববর্ষ পালনকে মানুষের কল্যাণে আরও অর্থবহ ও সুদূরপ্রসারী করে তুলতে স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় কর্মীদের উদ্যোগে ব্যানার-ফেস্টুনসহ দুর্নীতিবিরোধী স্লোগান, র‍্যালি ও সমাবেশের আয়োজন করা হবে। বঙ্গবন্ধু দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জাতি-লিঙ্গ-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর জোর দিতেন। তাই মুজিববর্ষ পালনের আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

৬. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে মূল তাৎপর্য হলো– মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল আকাঙ্ক্ষা 'ক্ষুধা-দারিদ্র্য-শোষণ-বঞ্চনামুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' বিনির্মাণ। সাম্য, মানবিক মর্যাদাবোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি সামনে রেখে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এদেশের আপামর জনসাধারণ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির রাজনৈতিক মুক্তি ঘটলেও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তির পথে ব্যাঘাত ঘটে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রনায়কোচিত নেতৃত্বে সেই স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের অভিযাত্রায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আমলে ক্ষুধা নিবারণে, দারিদ্র্য হ্রাসে, শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে, গড় আয়ু বৃদ্ধিতে, কৃষি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্য আজ বিশ্ব পরিমণ্ডলে স্বীকৃত। তবে এখনও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার অনেক প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। জননেত্রী শেখ হাসিনা তার মেধা, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা সকল বাধা-বিপত্তি, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করে দেশকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পরে তার নেতৃত্বে ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ সেই ভিত গড়ে দিয়েছে। রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যসমূহ পূরণে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ বহুলাংশে অর্জিত হওয়ায় জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৮.১৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনীয় ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণ, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন এবং বেসরকারি খাতের বিকাশ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হওয়ায় দেশ আজ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে, প্রশস্ত হয়েছে সুউচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথ। জননেত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়ন দর্শনের পাশাপাশি উচ্চতর মানবিক দর্শনেও বিশ্বাসী। তারই ধারাবাহিকতা রক্ষায় তিনি নতুন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করেছেন। এই রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে শান্তিপূর্ণ, সমৃদ্ধ ও উন্নত আবাসভূমি। বাঙালি হবে সারাবিশ্বের মাঝে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত জাতি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপনকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা ও বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বহুমুখী জমকালো ও আড়ম্বরপূর্ণ কর্মযজ্ঞ নির্ধারণ করা হবে। এ বছরটি বাঙালি জাতির জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই আমরা বৃহত্তর পরিসরে জাতীয় সংস্কৃতির সুমহান ঐতিহ্য ও লোক সংস্কৃতির আলোকে নানা আঙ্গিকে, বর্ণে ও বৈচিত্র্য-বিভায় উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত অগ্রাধিকারসমূহ বাস্তবায়নে সকলকে সংঘবদ্ধ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান আদর্শের আলোয় আলোকিত হয়ে জাতি-ধর্ম-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য শান্তি ও স্বস্তির জীবন বিধান নিশ্চিত করাই হবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গৌরবদীপ্ত অঙ্গীকার।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের
২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২০১৯-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক
সংশোধিত ও অনুমোদিত

The Constitution

of
Bangladesh Awami League
as modified upto 20-21 December 2019

ড. আবদুস সোবহান গোলাপ এম.পি
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
ও
আমিনুল ইসলাম
উপ-প্রচার সম্পাদক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
কর্তৃক
২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

গঠনতন্ত্র

১. নাম

এই প্রতিষ্ঠানের নাম হইবে 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ'।

২. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহত করা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা সমুন্নত রাখা।

(২) প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। জনগণের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা।

(৩) রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি এবং কল্যাণ নিশ্চিত করা।

(৪) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

২(ক). মূলনীতি

বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা তথা সকল ধর্মের সম-অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং সমাজতন্ত্র তথা শোষণমুক্ত সমাজ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হইবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মূলনীতি।

২(খ) অঙ্গীকার।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্র, কর্মসূচি ও নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

একটি উন্নত-সমৃদ্ধ কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প সংবলিত এই ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচির মৌলিক লক্ষ্য ও অঙ্গীকার হইবে–

(১) স্বাধীনতার আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ সমুন্নত রাখা।

(২) মানবসত্তার মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি।

(৩) বাংলাদেশের জনগণের ঐক্য ও সংহতির বিধান।

(৪) সংসদীয় গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান। জনগণের পছন্দমতো ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

(৫) একটি গণমুখী, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক দক্ষ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা ও সুশাসন নিশ্চিত করা।

(৬) রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি স্তরের সকল প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতির চর্চা ও অনুশীলন করা।

(৭) তৃণমূল পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার সকল স্তরে জনগণের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

(৮) নর-নারী, ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং তাহাদের উন্নত জীবন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান।

(৯) ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিলোপ সাধন।

(১০) আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুরক্ষাকরণ; জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদক ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন।

(১১) নারী নির্যাতন বন্ধ, নারীর অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ এবং রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সুনিশ্চিত করিয়া নারীর ক্ষমতায়ন।

(১২) শিশুর অধিকার সংরক্ষণ, তাহাদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সুযোগের নিশ্চয়তা বিধান, বিশেষ করে অটিস্টিক শিশুদের আনুকূল্যে বিশেষ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা এবং যুবসমাজের উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা।

(১৩) সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা।

(১৪) অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানসহ মানুষের জীবন ধারণের মৌলিক সমস্যার সমাধান এবং কর্মের অধিকার ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।

(১৫) অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার অবসান, দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকতর কর্মসংস্থান, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, একপাক্ষিক বৈদেশিক নির্ভরশীলতা কাটানো, ব্যক্তি খাত এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতের যৌথ উদ্যোগে (পিপিপি) উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা-সহ একটি শিল্পসমৃদ্ধ শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করা।

(১৬) সর্বাঙ্গীন গ্রামীণ উন্নয়ন, ভূমি ও কৃষি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, কৃষিতে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা, আধুনিকায়ন, কৃষিতে টেকসই প্রযুক্তির ব্যবস্থা এবং সমবায়-ব্যবস্থা বহুমুখীকরণ ও ফলপ্রসূ করা।

(১৭) খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতার ধারা অব্যাহত রেখে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা তথা ভাতের অধিকার ও পুষ্টিমান নিশ্চিত করা। কৃষিপণ্যের লাভজনক দামের নিশ্চয়তা বিধান।

(১৮) জাতীয় স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিসংগত ব্যবহার নিশ্চিত করা, দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বিদ্যুতায়ন, যোগাযোগ ও আইটি খাতসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

(১৯) মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান। সমাজের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্বজনীন, সুলভ ও প্রগতিশীল শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই নীতির ভিত্তিতে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারকে উৎসাহিতকরণ।

(২০) বাঙালি জাতির সভ্যতা, কৃষ্টি, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিতকরণ এবং জীবনবিমুখ, অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ বিনোদন ও অপ-সংস্কৃতি প্রতিরোধ করা। দেশের আদিবাসী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও উপজাতীয় জনগণের জীবনধারা, ভাষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করা।

(২১) শ্রমজীবী, সমাজের দুর্বল, অনগ্রসর, শোষিত-বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মানবেতর জীবন হইতে উত্তরণে সার্বিক সহায়তা প্রদান। পঙ্গু, অসহায় বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, হিজড়া, দরিদ্র বয়স্ক, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাসহ সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

(২২) বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি মোকাবিলায় বৈশ্বিক ও দেশীয় সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ। পানিসম্পদের প্রাপ্যতা, সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ। পরিবেশ সংরক্ষণ, বন সৃজন ও সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারণ উৎসাহিত করা, প্রাণিবৈচিত্র্য রক্ষা এবং গ্রিন হাউস অ্যাফেক্ট রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২৩) অপরিকল্পিত নগরায়ন রোধ, শহরাঞ্চলে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দূর করা। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত পরিকল্পিত গ্রামীণ জনপদ গড়িয়া তোলা।

(২৪) বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার লক্ষ্যে আধুনিক, যুগোপযোগী ও শক্তিশালী প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা।

(২৫) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতির ভিত্তি হইবে সকলের সহিত বন্ধুত্ব কাহারও প্রতি বৈরিতা নয়। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগিতা করা এবং সন্ত্রাসবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জাতি ও জনগণের ন্যায়সংগত মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করা।

উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বর্ণিত মূলনীতি ও অঙ্গীকার অনুসরণ এবং বাস্তবায়নে জাতীয় ঐক্য, উদ্দীপনা ও নবজাগরণ সৃষ্টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সদা সচেষ্ট থাকিবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের শোষণমুক্ত এক উন্নত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অবিচল নিষ্ঠা, সততা, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার সহিত সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবে।

৩. পতাকা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পতাকা হইবে ডানের দুই-তৃতীয়াংশ সবুজ এবং বামের এক-তৃতীয়াংশ লাল। পতাকার সবুজ অংশের উপরিভাগের দক্ষিণ কোণে সমদূরত্বসম্পন্ন ৪টি লাল তারকা খচিত থাকিবে। পতাকার আকারের অনুপাত ৫:৩।

৪. গঠন প্রণালি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক স্তর বিন্যাস হইবে নিম্নরূপ, যথা–

(১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল।
(২) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় কমিটি।
(৩) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটি
(৪) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা পরিষদ।
(৫) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড।
(৬) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় (পার্লামেন্টারি) পার্টি।
(৭) স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ড।
(৮) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক অনুমোদিত জেলা আওয়ামী লীগসমূহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত সকল মহানগর আওয়ামী লীগ এবং উহাদের অন্তর্ভুক্ত শাখা আওয়ামী লীগসমূহ।

৫. সদস্যপদ

(১) এই গঠনতন্ত্রের ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বাস করিয়া নির্ধারিত ফরমে প্রদত্ত ঘোষণাপত্রে দস্তখতপূর্বক ত্রি-বার্ষিক ২০ (বিশ) টাকা চাঁদা প্রদান করিয়া ১৮ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক বাংলাদেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক, যাহারা–

(ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অখণ্ডত্ব, জাতীয় সংহতি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও জননিরাপত্তা-বিরোধী এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান নহেন;
(খ) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগকারী বা নাগরিকত্ব বাতিলকৃত ব্যক্তি নহেন;
(গ) অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নহেন;
(ঘ) ধর্ম, পেশা এবং জন্মগত শ্রেণি ও বর্ণের ভিত্তিতে কোনো প্রকার বৈষম্যে বিশ্বাস করে না;

(ঙ) আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী কোনো সংগঠনের সদস্য নহেন;

(চ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ কর্তৃক নির্দেশিত ন্যূনতম প্রশিক্ষণ গ্রহণে ও যে কোনো নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন। এবং

(ছ) ত্রি-বার্ষিক চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করিবেন– তাহারা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) সংগঠনে দুই প্রকারের সদস্যপদ থাকিবে। যথা– প্রাথমিক (অস্থায়ী সদস্য) ও পূর্ণাঙ্গ সদস্য। দলের সদস্যপদ প্রার্থীকে দলের প্রাথমিক বা শাখা কমিটির নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং ত্রি-বার্ষিক চাঁদা বাবদ ২০.০০ (বিশ) টাকা দরখাস্তের সহিত প্রদান করিতে হইবে। প্রাথমিক বা শাখা কমিটির সদস্যদের সাধারণ সভায় প্রার্থীর সদস্যপদ অনুমোদিত হইলে তিনি অনুমোদনের তারিখ হইতে এক বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। প্রাথমিক সদস্যের মেয়াদ পূর্ণ হইলে সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রাথমিক সদস্যকে পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ প্রদানের জন্য দলীয় জেলা কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন। জেলা কার্যনির্বাহী সংসদ দলের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ প্রদান করিতে পারিবেন। সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকিলে মেয়াদান্তে আপনাআপনি পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করিবেন। পূর্ণাঙ্গ সদস্য না হইলে কেহ সংগঠনের কোনো স্তরে কর্মকর্তা নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(৩) সদস্যপদের মেয়াদ

বাংলা বৎসরের পহেলা বৈশাখ হইতে পরবর্তী তৃতীয় বৎসরের চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সদস্যপদ বলবৎ থাকিবে। এই উপধারায় উল্লিখিত মেয়াদান্তে ৫(১) ধারায় নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিয়া নির্ধারিত ফরমে দস্তখত করিয়া সদস্যপদ পুনরুজ্জীবিত করা যাইবে।

(৪) সংগঠনের সর্বস্তরের মহিলা প্রতিনিধিত্ব

২০২১ সালের মধ্যে ক্রমান্বয়ে পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদসহ দলের সকল স্তরের কমিটিতে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। নারী-পুরুষের সমতা আনিবার লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান হারে এই অনুপাতে বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে।

৬. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল

(১) প্রতি তিন বৎসর অন্তর জেলা আওয়ামী লীগসমূহ ও বিভিন্ন মহানগর আওয়ামী লীগ দ্বারা নির্বাচিত নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলার সমবায়ে

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে। জেলা আওয়ামী লীগসমূহ এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ মহানগর আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আহূত ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী সভার নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে তাহাদের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল সভায় নিজস্ব কর্মকর্তা ও তাহাদের স্ব-স্ব জেলা হইতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্বাচন করিয়া তাহাদের পূর্ণ ঠিকানাসহ নামের তালিকা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে অবশ্যই প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রত্যেক মহানগর ও জেলার প্রতি ২৫ (পঁচিশ) হাজার জনসংখ্যার জন্য একজন করিয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন। ভগ্নাংশের বেলায় যথাক্রমে প্রতি ১২ হাজারের অধিক জনসংখ্যার জন্য একজন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন।

(৩) কোনো জেলা বা মহানগর আওয়ামী লীগ কোনো কারণবশত যদি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলার ও তাহাদের নিজস্ব কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলি অনুসারে নির্বাচন করিতে না পারে, তাহা হইলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ উক্ত জেলা বা মহানগরের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলার মনোনয়ন দান করিতে পারিবে।

(৪) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের কর্মকর্তাসহ সদস্যবৃন্দ পদাধিকার বলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলার হইবেন।

(৫) ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল, বার্ষিক কাউন্সিল বা বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহূত হইবার পর সহযোগী সংগঠনের নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিলার হিসেবে মনোনীত হইবেন।

(৬) এই অনুচ্ছেদে নির্বাচিত বা মনোনীত কাউন্সিলারগণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে আহূত ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী সভার প্রথম অধিবেশনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে কোনো শাখায় প্রাথমিক সদস্যভুক্ত ১০০ জন সদস্যকে কাউন্সিলার হিসেবে কো-অপট করিয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সদস্যভুক্ত করিয়া লইবেন।

৭. ৬(৩) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মনোনীত কাউন্সিলারগণ নির্বাচিত কাউন্সিলারদের মতোই সম-অধিকার ভোগ করিবেন। কিন্তু মনোনয়নের পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে ঐসব জেলা বা মহানগর আওয়ামী লীগের নির্বাচনের ব্যবস্থা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে করিতে হইবে। উক্ত জেলা বা মহানগর নিজস্ব কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলার নির্বাচন করার পর নির্বাচিত কাউন্সিলারগণ উক্ত জেলা বা মহানগর আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মনোনীত কাউন্সিলারদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন। মনোনয়ন দান হইতে নতুন নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ উক্ত জেলা ও মহানগরের পূর্ববর্তী কমিটিকে বা তদস্থলে এডহক কমিটি গঠন করিয়া উক্ত কমিটিকে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড চালাইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৮. মনোনয়ন, কো-অপশন বা কোনো শাখা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ত্রুটি-বিচ্যুতির অজুহাতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অন্যায়রূপে গঠিত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা যাইবে না এবং কাউন্সিলের কোনো কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত এই সকল কারণে রদ, বাতিল, বে-আইনি বা গঠনতন্ত্র-বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৯. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচিত, কো-অপশনকৃত বা মনোনীত কাউন্সিলারগণকে সভায় যোগদান করিবার পূর্বে ত্রি-বার্ষিক জনপ্রতি ২০০ (দুই শত) টাকা চাঁদা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করিতে হইবে।

১০. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোনো কাউন্সিলার যদি তাহার নির্বাচনের প্রথম চার মাসের মধ্যে ত্রি-বার্ষিক ২০০ (দুই শত) টাকা চাঁদা পরিশোধ না করেন, তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ তাহার কাউন্সিলার পদ খারিজ করিয়া তদস্থলে নতুন কাউন্সিলার মনোনীত করিতে পারিবে। তবে, সদস্যপদ খারিজ করার পূর্বে উক্ত সদস্যকে সাত দিনের মধ্যে দেয়-চাঁদা পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া পোস্টাল রেজিস্ট্রেশনযোগে নোটিস দিতে হইবে।

১১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা

সভাপতির নির্দেশ বা অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক যে কোনো সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী অধিবেশন ব্যতীত বৎসরে অন্তত একবার বাংলাদেশ

আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল সভা আহ্বান করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ন্যূনপক্ষে শতকরা ২০ জন বা ৫ ভাগের ১ ভাগ কাউন্সিলারের স্বাক্ষর ও আলোচ্য বিষয়-সংবলিত রিকুইজিশনপত্র সাধারণ সম্পাদক বা সভাপতির নিকট দাখিল করিবার ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক নিজে বা সভাপতির নির্দেশে কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠান করিবেন। এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত হইলে কাউন্সিল সভার কোরাম হইবে। কিন্তু মুলতবি সভার জন্য কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

১২. (১) অনুচ্ছেদ ১১-এর আওতায় যে কোনো কাউন্সিল সভায় সভাপতি এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভাপতিমণ্ডলীর যে কোনো সদস্য বা তাহাদের অনুপস্থিতিতে সদস্যদের যে কেহ নির্বাচিত হইয়া সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) রিকুইজিশনপত্র পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে যদি সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান না করেন, তবে রিকুইজিশনকারী সদস্যগণ ৩০ দিন পরে নিজেরাই ২১ দিনের নোটিস দিয়া সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১৩. কার্যনির্বাহী সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের বিশেষ বা বার্ষিক ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

১৪. কাউন্সিলের বিশেষ বা বার্ষিক ত্রি-বার্ষিক অধিবেশনে সকল জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আমন্ত্রণক্রমে তাহাদের স্ব-স্ব জেলা ও মহানগর হইতে নির্বাচিত কাউন্সিলারের সমসংখ্যক ডেলিগেট পাঠাইতে পারিবে।

১৫. কাউন্সিলের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী সভা, বার্ষিক সভা বা বিশেষ সভার জন্য সাধারণত ১৫ দিনের ও জরুরি সভার জন্য সাত দিনের নোটিস দিতে হইবে। নোটিসে আলোচ্য বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। সংবাদপত্র মারফতও অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে।

১৬. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের কার্যাবলি ও ক্ষমতা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল

(১) আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিবে;

(২) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজনে যে কোনো নীতি বা পন্থা বা প্রস্তাব গ্রহণ করিবে;

(৩) গঠনতন্ত্রের ২০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কর্মকর্তা নির্বাচন করিবে;

(৪) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি সংসদীয় (পার্লামেন্টারি) বোর্ড গঠন করিবে;

(৫) বিনাশর্তে বা শর্তাধীনে গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে কোনো ক্ষমতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের ওপর ন্যস্ত করিতে পারিবে।

১৭. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটি

(১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি জাতীয় কমিটি থাকিবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলা হইতে একজন করিয়া সদস্য স্ব-স্ব জেলা ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল কর্তৃক জাতীয় কমিটিতে নির্বাচিত হইবেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা, কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যবৃন্দ এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২১ জন সদস্য এবং উপর্যুক্তভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যবৃন্দকে লইয়া বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে। জাতীয় কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা হইবে ১৮০ জন, যার মধ্যে ৮১ জন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য, ৭৮ জন সাংগঠনিক জেলা প্রতিনিধি এবং ২১ জন সভাপতি কর্তৃক মনোনীত। জাতীয় কমিটি নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবে–

(২) জাতীয় কমিটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ ও কাউন্সিলের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করিবে।

(৩) যে কোনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলকে সহায়তা করিবে।

(৪) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলি পর্যালোচনা করিতে পারিবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী বা বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ কার্যকর করিবে।

(৫) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ ও অনুমোদন করিবে।

(৬) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপিল বিবেচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৭) সংসদীয় পার্টি পরিচালনার জন্য নিয়মাবলি প্রণয়ন করিবে।

(৮) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তা পদাধিকার বলে জাতীয় কমিটির কর্মকর্তারূপে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৯) বছরে জাতীয় কমিটির একটি সভা আহ্বান করিতে হইবে। তবে দলের সভাপতির নির্দেশক্রমে একাধিক সভা আহ্বান করা যাইবে।

১৮. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যগণ, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, কোষাধ্যক্ষ এবং সভাপতিমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ২৮ জন সদস্যসহ মোট ৮১ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ গঠিত হইবে।

১৯. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি গঠনতন্ত্রের ১৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যনির্বাহী সংসদের ২৮ জন সদস্য সভাপতিমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে মনোনয়ন দান করিবেন এবং উক্ত মনোনয়ন কাউন্সিল অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার ২১ দিনের মধ্যে ঘোষণা করিতে হইবে।

২০. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাগণ

(১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের কর্মকর্তাবৃন্দ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা নামে অভিহিত হইবেন।

(২) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা থাকিবেন, যথা– (ক) সভাপতি, (খ) সভাপতিমণ্ডলীর ১৭ জন সদস্য (সাধারণ সম্পাদকসহ পদাধিকার বলে সদস্যসহ সভাপতিমণ্ডলীর মোট সদস্য বিশিষ্ট হইবে ১৯, (গ) সম্পাদকমণ্ডলী, (ঘ) কোষাধ্যক্ষ (একজন) এবং সদস্য (২৮ জন)।

সম্পাদকমণ্ডলী–

১. সাধারণ সম্পাদক
২. চারজন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (নিম্নের পদগুলি পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত হইবে)
৩. অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক
৪. আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
৫. আইন বিষয়ক সম্পাদক
৬. কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
৭. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
৮. ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক
৯. দফতর সম্পাদক
১০. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১৪. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
১৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
১৬. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
১৭. শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
১৮. শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক
১৯. শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক সম্পাদক
২০. সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক
২১. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
২২. সাংগঠনিক সম্পাদক (আটজন)
২৩. উপ-দফতর সম্পাদক
২৪. উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
(সম্পাদকমণ্ডলী মোট ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট)
* কোষাধ্যক্ষ – একজন। সদস্য – ২৮ জন।

২১. সভাপতি, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ নিজ নিজ পদে ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল কর্তৃক কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। উল্লিখিত কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যগণের কার্যকাল হইবে তিন বৎসর। তবে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত তাহারা স্বপদে বহাল থাকিবেন।

২২. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সভা

(১) সাধারণ সম্পাদক সভাপতির পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের বা সভাপতিমণ্ডলীর সভা আহ্বান করিবেন। সভাপতির নির্দেশক্রমে সাধারণ সম্পাদক উক্ত সংসদের সভা আহ্বান করিতে বাধ্য থাকিবেন। সভাপতির নির্দেশক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান না করিলে সভাপতি নিজেই সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সাধারণত কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

(২) সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদক তিন দিনের নোটিসে সভাপতিমণ্ডলীর সভা আহ্বান করিবেন। জরুরি সভা যে কোনো সময় ডাকিতে পারিবেন। সভাপতিমণ্ডলীর সভায় আটজন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

২৩. কার্যনির্বাহী সংসদের সভার জন্য সাধারণত সাত দিনের নোটিস দিতে হইবে; তবে জরুরি সভার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়ের নোটিসের প্রয়োজন হইবে না। আবশ্যক হইলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে নোটিস দিয়া জরুরি সভা আহ্বান করা যাইবে।

২৪. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের কার্যাবলি ও ক্ষমতা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পন্ন ও ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবে–

(১) শাখা আওয়ামী লীগসমূহকে অনুমোদন দান, বাতিলকরণ, পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করা বা প্রয়োজনবোধে যে কোনো শাখা কমিটি বাতিল করিয়া তদস্থলে এডহক কমিটি গঠন করা এবং এডহক কমিটি গঠনের ছয় মাসের মধ্যে উক্ত শাখার নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। অন্যথায় ছয় মাস পর এডহক কমিটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল, জাতীয় কমিটি, কার্যনির্বাহী সংসদ বা অন্য কোনো কমিটি বা সংসদীয় বোর্ডের সদস্যপদ বা স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যপদ বা আওয়ামী লীগের কোনো কর্মকর্তার পদ শূন্য হইলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ উক্ত পদ শূন্য হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে কো-অপশন বা মনোনয়ন দ্বারা উক্ত শূন্যপদ অবশ্যই পূরণ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল বা ইহার সদস্যের প্রতি নির্দেশ, উপদেশ ও নিয়ন্ত্রণাদেশ দেওয়ার ক্ষমতা সভাপতিমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে সভাপতির থাকিবে এবং উপরিউক্ত সদস্যের কেহ উহা অমান্য করিলে অথবা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও সিদ্ধান্ত তথা নীতি ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোনো কাজ করিলে সভাপতিমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে সভাপতি উহা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করিবেন।

(৪) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় কমিটিতে দাখিল করিবার উদ্দেশ্যে আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা।

(৫) ১,০০,০০০ (এক লাখ) টাকার অনূর্ধ্ব যে কোনো ব্যয় অনুমোদন করা।

(৬) সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক কর্মচারী নিয়োগ বা বরখাস্ত অনুমোদন করা।

(৭) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের যে কোনো সদস্য বিনা কারণে বা সন্তোষজনক কারণ ব্যতিরেকে পরপর ৩টি সাধারণ সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার নাম কার্যনির্বাহী সংসদের তালিকা

হইতে খারিজ করা হইবে এবং শূন্যপদ নিয়মানুযায়ী পূরণ করা হইবে। তবে সদস্যপদ খারিজ করিবার পূর্বে উক্ত সদস্যকে নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সন্তোষজনক কারণ দর্শাইবার জন্য পোস্টাল রেজিস্ট্রেশনযোগে নোটিস প্রদান করিতে হইবে।

(৮) ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের নির্বাচনী বা বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশন আহ্বান এবং ইহার তারিখ, স্থান ও আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করা।

(৯) আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ করিবার তারিখ নির্ধারণ করা, বিভিন্ন শাখার নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা এবং বাংলাদেশ আদমশুমারি অনুসারে ৬(২) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে কোন জেলা বা মহানগর হইতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের জন্য কতজন সদস্য নির্বাচিত হইবেন উহা হিসাব করিয়া জেলা, পৌর ও মহানগর আওয়ামী লীগের নির্বাচনের পূর্বে উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা।

(১০) আবশ্যকবোধে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগীয় সম্পাদকের কার্যক্রম নির্ধারণ করা।

(১১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে নিম্নস্থ যে কোনো শাখা কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপিল বিবেচনা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

২৫. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্মকর্তাগণের কার্যাবলি ও ক্ষমতা

(১) সভাপতি

সভাপতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে গণ্য হইবেন। তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল, জাতীয় কমিটির সকল অধিবেশন, কার্যনির্বাহী সংসদ ও সভাপতিমণ্ডলীর সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সংগঠনের গঠনতন্ত্রের যে কোনো ধারা ব্যাখা করিয়া রুলিং দিতে পারিবেন।

(ক) সভাপতি ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যদের মনোনয়ন ঘোষণা করিবেন।

(খ) সভাপতিমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে তিনি বিষয় নির্ধারণী কমিটির সদস্যদের মনোনয়ন দান করিবেন।

(গ) সভাপতি তাহার অনুপস্থিতিকালের জন্য সভাপতিমণ্ডলীর যে কোনো সদস্যকে সভাপতির কার্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(ঘ) সভাপতির পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান না করিলে সভাপতি নিজেই ২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ বা সভাপতিমণ্ডলীর সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(ঙ) সভাপতি ১৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় কমিটির ২১ জন সদস্য মনোনীত করিবেন।

(চ) সভাপতি বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে একজন সদস্যের প্রস্তাবক্রমে এবং অন্য একজন সদস্যের সমর্থনক্রমে সভাপতিমণ্ডলীর যে কোনো সদস্য কোনো অধিবেশন বা সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(ছ) সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যগণ তাহাদের কার্যক্রমের জন্য সভাপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

(জ) সভাপতি ২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৫১ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ মনোনীত করিবেন। তিনি উপদেষ্টা পরিষদের সহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরামর্শ করিবেন।

(ঝ) সভাপতি বিভাগীয় (সম্পাদকীয় বিভাগ) উপ-কমিটিসমূহ গঠন করিবেন।

(ঞ) সভাপতি উপ-কমিটিসমূহের কার্যাদি তদারক ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা করিবেন।

(ট) সংগঠনের কোনো কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে সভাপতি এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তাহা কার্যনির্বাহী সংসদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবেন।

(২) সভাপতিমণ্ডলীর ক্ষমতা

সভাপতিমণ্ডলী ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য মনোনয়নের ব্যাপারে সভাপতিকে পরামর্শ দিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সভাপতির মাধ্যমে কার্যনির্বাহী সংসদ বা কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো ক্ষমতা গ্রহণ ও প্রয়োগ করিতে পারিবেন। আওয়ামী লীগের আদর্শ, নীতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি ও সংগঠন বিষয়ে প্রশিক্ষণদানসহ সভাপতিমণ্ডলী সংগঠনের সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করিতে ও সিদ্ধান্ত লইতে পারিবেন। সভাপতিমণ্ডলী সম্পাদকমণ্ডলীর সহিত আলোচনাক্রমে রাষ্ট্রের ঐক্য, কল্যাণ, নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ জরুরি অবস্থায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। সভাপতিমণ্ডলী কার্যনির্বাহী সংসদ বা কাউন্সিলের অনুমোদনসাপেক্ষ জরুরি ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের প্রত্যেকে নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে যৌথভাবে দায়-দায়িত্ব বণ্টন করিবেন। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। কোনো কারণে সদস্যবৃন্দ যদি কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাইতে না পারেন, তবে অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সাধারণ সম্পাদক

সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের প্রধান কর্মসচিব/নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হইবেন। তিনি সমস্ত বিভাগীয় সম্পাদককে বা তাহাদের বিভাগীয় কার্যাবলি সম্পাদন করিবার জন্য উপদেশ ও আদেশ দিতে পারিবেন। প্রতি মাসে অন্তত একবার তিনি সম্পাদকমণ্ডলীর সভা ডাকিবেন এবং উক্ত সভায় বিভাগীয় কার্যাবলির অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন; তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার কার্যনির্বাহী সংসদের ওপর ন্যস্ত থাকিবে। তিনি কার্যনির্বাহী সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষ সংগঠনের কর্মচারী নিয়োগ, বরখাস্ত, বেতন বৃদ্ধি বা হ্রাস, ছুটি মঞ্জুর ও শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। সভাপতিমণ্ডলী, কার্যনির্বাহী সংসদ, জাতীয় কমিটি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সাধারণ সম্পাদক প্রত্যেকটি কাউন্সিল সভায় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করিবেন। এতদ্‌ভিন্ন যে ক্ষমতা কাউন্সিল বা জাতীয় কমিটি তাহার ওপর ন্যস্ত করিবে, তাহাও তিনি প্রয়োগ করিবেন। "তিনি জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর বিধান অনুসরণে জাতীয় নির্বাচনে কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রণীত দলীয় সকল নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী সত্যায়িত করিবেন এবং নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে তাহা নির্বাচন কমিশনে পেশ করিবেন।" তিনি বিভাগীয় সম্পাদকদের নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যাবলি ছাড়াও সংগঠনের যে কোনো কাজ সম্পাদন করিবার জন্য যে কোনো যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অথবা বিভাগীয় সম্পাদকের ওপর দায়িত্ব দিতে পারিবেন এবং তাহারা তাহা পালন করিবেন। সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সভাপতির সহিত পরামর্শপূর্বক সময়ে সময়ে সাংগঠনিক সম্পাদকদের প্রশাসনিক বিভাগওয়ারি দায়িত্ব বণ্টন করিবেন। সাধারণ সম্পাদক কার্য উপলক্ষে অনুপস্থিত থাকিলে অনুপস্থিতিকালের জন্য তাহার সমস্ত কার্য ও দায়িত্ব পালনের ভার নামের ক্রমানুসারে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকদের ওপর এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকগণ অনুপস্থিত থাকিলে তাহাদের সমস্ত দায়িত্ব ক্রমানুসারে বিভাগীয় সম্পাদকদের ওপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৪) বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ

বিভাগীয় সম্পাদকবৃন্দ নিজ নিজ বিভাগীয় কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় কমিটি, কার্যনির্বাহী সংসদ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত, নির্দেশ ও উপদেশাবলি কার্যকর করিবেন। বিভাগীয় সম্পাদকগণ নিজ নিজ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার জন্য কার্যনির্বাহী সংসদের সভা আহ্বানের প্রয়োজন মনে করিলে সাধারণ সম্পাদককে উক্ত সমস্যা জানাইয়া সভা আহ্বানের অনুরোধ করিতে পারিবেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রত্যেক কাউন্সিল সভায় বিভাগীয় সম্পাদকগণ সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট মারফত তাহাদের স্ব-স্ব বিভাগের কার্যাবলির অগ্রগতি সম্পর্কে কাউন্সিলারগণকে অবহিত করিবেন। প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী সংসদ বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে

বিভিন্ন বিভাগের কাজ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করিয়া দিবেন। সম্পাদকবৃন্দ স্ব-স্ব বিভাগের উপ-কমিটির সদস্য সচিব হবেন।

(৫) কোষাধ্যক্ষ

সংগঠনের সমস্ত অর্থ কোষাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত থাকিবে। সভাপতির সহিত যৌথ স্বাক্ষরে দলের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিবেন। তিনি সাধারণ সম্পাদকের নিকট হইতে লিখিত রসিদ পাইয়া অর্থ প্রদান করিবেন। তিনি জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-এর বিধান প্রতিপালনের নিমিত্তে সকল ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের দ্বারা উহা সত্যায়িত করিয়া লইবেন।

(৬) বিভাগীয় উপ-কমিটি গঠন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রত্যেক সম্পাদকীয় বিভাগের কার্যক্রম অধিকতর গতিশীল ও সমন্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি সম্পাদকীয় বিভাগে একটি করিয়া উপ-কমিটি গঠন করিবে। উক্ত উপ-কমিটি একজন চেয়ারম্যান, একজন সম্পাদক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সদস্য, সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে। জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সদস্যবৃন্দ, যাহারা বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, তাহারা পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত উপ-কমিটির সদস্য হইবেন। সংগঠনের সভাপতি কর্তৃক উপ-কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হইবে এবং তিনি উপ-কমিটিসমূহ গঠন করিয়া দিবেন। সভাপতি সংগঠনের সভাপতিমণ্ডলী, উপদেষ্টা পরিষদ এবং কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যদের মধ্য হইতে উপ-কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত করিবেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সম্পাদক সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটির সদস্য সচিব হইবেন। উপ-কমিটিসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রম জোরদার করার কাজে সহায়তা করিবে। উপ-কমিটি সেমিনার, আলোচনা সভা ও কর্মশালার আয়োজন করিবে। প্রত্যেক বিভাগ উহার কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ করিবে এবং সময়ে সময়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর সুপারিশসহ প্রতিবেদন তৈরি করিবে। তাহা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদকে অবহিত করিবে। প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার উপ-কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় স্ব-স্ব উপ-কমিটি তাহাদের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন ও করণীয় নির্ধারণ করিবে।

(৭) সহযোগী সংগঠন

(ক) বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কৃষক লীগ, বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ, বাংলাদেশ তাঁতী লীগ, বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ ও বাংলাদেশ আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ বাংলাদেশ

আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বলিয়া গণ্য হইবে। তবে জাতীয় শ্রমিক লীগ ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তাদের স্ব-স্ব সংগঠনের গঠনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হইবে।

(খ) সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট স্তরের ডেলিগেট হিসেবে গণ্য হইবেন।

(গ) সহযোগী সংগঠনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বা প্রতিনিধি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্ট স্তরের কমিটির সভায় আমন্ত্রণসাপেক্ষ যোগ দিতে পারিবেন।

২৬. উপদেষ্টা পরিষদ

(১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫১ জন হইবে। সভাপতি প্রয়োজনে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন। উপদেষ্টা পরিষদের ৩টি সেল থাকিবে। সেলসমূহ মূলত নিম্নবর্ণিত বিষয়ের ওপর কাজ করিবে, যথা–

(ক) রাজনৈতিক (খ) অর্থনৈতিক (গ) সামাজিক।

(২) উপদেষ্টা পরিষদ দলের চিন্তাকোষ বা 'থিংক ট্যাক' হিসেবে কাজ করিবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখিয়া বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দলের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ বা দিক-নির্দেশনা দিবে। উপদেষ্টা পরিষদ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের ওপর গবেষণা, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবে এবং সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দলের বক্তব্য, বিবৃতি, মন্তব্য ও প্রকাশনা-সহায়ক তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সরবরাহ করিবে।

(৩) সংগঠনের জেলা, মহানগর, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন পর্যায়েও কেন্দ্রের অনুরূপ উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে। মহানগরে ২৭ জন, জেলায় ২৭ জন, উপজেলা/থানায় ২১ জন ও ইউনিয়নে ১৫ জন সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে। জেলা, মহানগর, উপজেলা/থানা ও ইউনিয়ন উপদেষ্টা পরিষদ স্ব-স্ব ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে ঘোষিত হইবে।

(৪) সভাপতির পরামর্শে উপদেষ্টা পরিষদের যে কোনো সদস্য উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন। সংগঠনের সকল স্তরের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সংগঠনের সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন। তবে তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যদের যে কোনো একজনের প্রস্তাব ও অন্য আরেকজনের সমর্থনক্রমে যে কোনো সদস্য উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

২৭. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ড (পার্লামেন্টারি বোর্ড)

(১) বাংলাদেশ জাতীয় সংসদসহ জাতীয় পর্যায়ে সকল নির্বাচনে সংগঠনের পক্ষ হইতে প্রার্থী মনোনীত করার জন্য একটি সংসদীয় (পার্লামেন্টারি) বোর্ড গঠিত হইবে।

(২) সংসদীয় বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হইবে ১১ জন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা এই তিনজন পদাধিকার বলে উক্ত বোর্ডের সদস্য থাকিবেন। অবশিষ্ট আটজন সদস্য আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য হইতে কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। বোর্ডের কার্যকাল কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। পদাধিকার বলে যে তিনজন সদস্য থাকিবেন, তাহাদের মধ্যে একই ব্যক্তি একাধিক পদের অধিকারী হইলে বোর্ডের একটি সদস্যপদ শূন্য বিবেচিত হইবে। শূন্যপদে কাউন্সিল অতিরিক্ত একজন সদস্য নির্বাচন করিবে। কাউন্সিল-পরবর্তী পর্যায়ে বোর্ডের কোনো সদস্যপদ শূন্য হইলে উক্ত শূন্য পদে পরবর্তী কাউন্সিলের অনুমোদনসাপেক্ষ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ নতুন সদস্য মনোনীত করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি পদাধিকার বলে উক্ত বোর্ডের সভাপতি থাকিবেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সংসদীয় বোর্ডের সম্পাদক হইবেন।

(৪) সংসদীয় বোর্ড নির্বাচন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করিবেন। বোর্ড নির্বাচনী কর্মসূচি প্রণয়ন ও নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। নির্বাচনে যাহারা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রার্থী হইবেন, তাহারা উক্ত বোর্ডের নিকট মনোনয়ন প্রার্থনা করিয়া যে দরখাস্ত দাখিল করিবেন, তাহার অনুরূপ এক কপি দরখাস্ত জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে লিখিত রসিদ লইয়া বা পোস্টাল রেজিস্ট্রেশনযোগে পাঠাইবেন।

(৫) উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী সংসদীয় আসনভিত্তিক মনোনয়ন প্রার্থীদের গুণাগুণ ও জনপ্রিয়তা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাদের সুপারিশ সংবলিত একটি প্রার্থী প্যানেল স্ব-স্ব সাংগঠনিক কমিটির মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ড বরাবর প্রেরণ করিবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় বোর্ড একজনের প্রার্থিতা চূড়ান্ত করিবে।

২৮. (১) স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ড

(ক) প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে মহানগর থেকে তৃণমূল (ইউনিয়ন কাউন্সিল) পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে প্রার্থী মনোনীত

করিবার জন্য একটি 'স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ড' গঠন করা হইবে। সংক্ষেপে 'স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ড' বলতে স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধি মনোনয়ন বোর্ডকে বুঝাইবে।

(খ) এই মনোনয়ন বোর্ড হইবে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট।

(গ) আওয়ামী লীগ কাউন্সিল/বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ ১৯ সদস্য বিশিষ্ট মনোনয়ন বোর্ড কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে নির্বাচন করিবে। দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে এই কমিটির সদস্য থাকিবেন।

(ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি পদাধিকার বলে উক্ত বোর্ডের সভাপতি থাকিবেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য সচিব হইবেন।

(ঙ) কোনো সদস্যপদ শূন্য হইলে, উক্ত শূন্য সদস্যপদে পরবর্তী কাউন্সিলে অনুমোদন সাপেক্ষ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ নতুন সদস্য মনোনয়ন দিবে।

(চ) মনোনয়ন বোর্ড অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট আবেদনপত্রে প্রার্থীগণ মনোনয়ন লাভের জন্য প্রশাসনের যে স্তরে স্থানীয় নির্বাচন সেই স্তরের আওয়ামী লীগ কমিটির কার্যকরী সংসদ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রার্থী আবেদন জমা দিবেন।

(ছ) মনোনয়ন বোর্ড স্থানীয় সরকারের যে কোনো স্তরে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রক্রিয়াসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড শুরু করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবে। দলীয় প্রার্থীর বিজয়ের লক্ষে বিভিন্ন স্তরে দলের কার্যকরী সংসদের কর্মকর্তা ও সদস্যদের নেতা-কর্মীদের নিয়ে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবার জন্য মনোনয়ন বোর্ড নীতিমালা তৈরি করিবে।

(২) স্থানীয় সরকারের স্তরগুলো নিম্নরূপ

(ক) সিটি কর্পোরেশন – ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, গাজীপুর।
(খ) জেলা পরিষদ – বাংলাদেশের সকল জেলা (৬৪টি জেলা)।
(গ) পৌরসভা – বাংলাদেশের সকল শ্রেণির (ক, খ, গ) পৌরসভা (৩২৮টি পৌরসভা)।
(ঘ) উপজেলা পরিষদ – বাংলাদেশের সকল উপজেলা (৪৯২টি উপজেলা)।

(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদ – বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ (৪ হাজার ৫৬৯টি ইউনিয়ন পরিষদ)।

(৩) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের শুধু চেয়ারম্যান পদের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রার্থী মনোনয়ন দিবে।

(খ) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন ঘোষণার পর মনোনয়ন বোর্ডের পক্ষ হইতে দেওয়া সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায় থেকে সমন্বিতভাবে মনোনয়ন প্রার্থীদের কমপক্ষে তিনজনের একটি প্রার্থী প্যানেল মনোনয়ন বোর্ড বরাবর প্রেরণ করিবে।

(গ) এই প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুতে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(ঘ) মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি প্রার্থী প্যানেল জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় বিবেচনায় রেখে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্ট আবেদনপত্রে মনোনয়ন প্রার্থীদের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিবে।

(ঙ) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি প্যানেল তৈরির জন্য কার্যনির্বাহী সংসদ ও সকল ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে বর্ধিত সভা করিবে। সভায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি প্যানেল সুপারিশের জন্য তৈরি করিবে।

(চ) এই প্যানেলটি জেলা ও উপজেলা, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের (মোট ছয়জনের) যুক্ত স্বাক্ষরে প্রার্থীদের যোগ্যতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, জনপ্রিয়তা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া কমপক্ষে তিনজনের সুপারিশ মনোনয়ন বোর্ডের কাছে নির্ধারিত সময় ও তারিখের মধ্যে পাঠাইবে।

(ছ) জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য হইলে তা তাহারা সুপারিশের সাথে উল্লেখ করিতে পারিবেন।

(জ) স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ড আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে একজন প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে।

(৪) উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা ও পুরুষ উভয়ই) পদে প্রার্থী মনোনয়ন দিবে।

(খ) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন ঘোষণার পর মনোনয়ন বোর্ডের পক্ষ হইতে দেওয়া সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে উপজেলা ও জেলা পর্যায় থেকে সমন্বিতভাবে মনোনয়ন প্রার্থীদের কমপক্ষে তিনজনের একটি প্রার্থী প্যানেল মনোনয়ন বোর্ডে প্রেরণ করিবে।

(গ) এই প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুতে উপজেলা আওয়ামী লীগ প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(ঘ) মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি প্যানেল জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় বিবেচনায় রাখিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্ট আবেদনপত্রে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিবে।

(ঙ) উপজেলা আওয়ামী লীগ সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি প্যানেল তৈরির জন্য উপজেলা কার্যনির্বাহী সংসদ সকল ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে বর্ধিত সভা করিবে। সভায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কমপক্ষে তিনজনের একটি প্যানেল সুপারিশের জন্য তৈরি করিবে।

(চ) এই প্যানেলটি জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের যুক্ত স্বাক্ষরে প্রার্থীদের যোগ্যতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, জনপ্রিয়তা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া কমপক্ষে তিনজনের সুপারিশ মনোনয়ন বোর্ডের কাছে নির্ধারিত সময় ও তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

(ছ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য হইলে তাহা সুপারিশের সাথে উল্লেখ করিতে পারিবেন।

(জ) স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ড আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজন প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে।

(৫) পৌরসভা নির্বাচন

(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র পদে মনোনয়ন দিবে।

(খ) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন ঘোষণার পর মনোনয়ন বোর্ডের পক্ষ হইতে দেওয়া সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা আওয়ামী লীগ পর্যায় থেকে সমন্বিতভাবে মনোনয়ন প্রার্থীদের মধ্য হইতে কমপক্ষে তিনজনের একটি প্রার্থী প্যানেল মনোনয়ন বোর্ডে প্রেরণ করিবে।

(গ) এই প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুতে পৌর আওয়ামী লীগ প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(ঘ) মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক একটি প্রার্থী প্যানেল জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় বিবেচনায় রাখিয়া পৌর আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্ট আবেদনপত্রে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিবে।

(ঙ) পৌর আওয়ামী লীগ সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি প্যানেল তৈরির জন্য পৌর আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ সকল ওয়ার্ড সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে বর্ধিত সভা করিবে। সভায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কমপক্ষে তিনজনের একটি প্যানেল সুপারিশের জন্য প্রেরণ করিবে।

(চ) এই প্যানেলটি পৌর, উপজেলা ও জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের যুক্ত স্বাক্ষরে প্রার্থীদের যোগ্যতা, নেতৃত্বের গুণাবলি ও জনপ্রিয়তা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া কমপক্ষে তিনজনের সুপারিশ মনোনয়ন বোর্ডের কাছে নির্ধারিত সময় ও তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

(ছ) জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা পর্যায়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে মতপার্থক্য হইলে তাহা তাহারা সুপারিশে উল্লেখ করতে পারিবেন।

(জ) স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ড আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজন প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে।

(৬) সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র ও কাউন্সিলার পদে মনোনয়ন দিবে।

মেয়র পদে মনোনয়ন

(ক) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন ঘোষণার পর মনোনয়ন বোর্ডের পক্ষ হইতে দেওয়া সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে মহানগর আওয়ামী লীগ মনোনয়ন প্রার্থীদের মধ্য হইতে কমপক্ষে তিনজনের একটি প্রার্থী প্যানেল মনোনয়ন বোর্ডে প্রেরণ করিবে।

(খ) এই প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুতে মহানগর আওয়ামী লীগ প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(গ) মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক একটি প্রার্থী প্যানেল জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় বিবেচনা রাখিয়া মহানগর আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্ট আবেদনপত্রে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিবে।

(ঘ) মহানগর আওয়ামী লীগ সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি প্যানেল তৈরির জন্য মহানগর কার্যনির্বাহী সংসদ, থানা এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে বর্ধিত সভা করিবে। সভায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কমপক্ষে তিনজনের একটি প্যানেল সুপারিশের জন্য তৈরি করিবে।

(ঙ) প্যানেলটি মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে প্রার্থীদের যোগ্যতা, নেতৃত্বের গুণাবলি ও জনপ্রিয়তা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া কমপক্ষে তিনজনের সুপারিশ মনোনয়ন বোর্ডের কাছে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

(চ) মহানগর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে মতপার্থক্য হইলে তাহা তাহারা সুপারিশে উল্লেখ করিতে পারিবেন।

(ছ) মনোনয়ন বোর্ড আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজন প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে।

কাউন্সিলর পদে মনোনয়ন

(ক) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন ঘোষণার পর মনোনয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে দেওয়া সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ের মধ্যে মহানগর আওয়ামী লীগ মনোনয়ন প্রার্থীদের মধ্য হইতে কমপক্ষে তিনজনের একটি প্রার্থী প্যানেল মনোনয়ন বোর্ডে প্রেরণ করিবে।

(খ) এই প্রার্থী প্যানেল প্রস্তুতে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(গ) মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক একটি প্রার্থী প্যানেল জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় বিবেচনা রাখিয়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সুনির্দিষ্ট আবেদনপত্রে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের আবেদন জমা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দিবে।

(ঘ) ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সম্ভাব্য প্রার্থীদের একটি প্যানেল তৈরির জন্য ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্যদের নিয়ে সভা করিবে। সভায়

আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কমপক্ষে তিনজনের একটি প্যানেল সুপারিশের জন্য তৈরি করিবে।

(ঙ) প্যানেলটি মহানগর, থানা ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে প্রার্থীদের যোগ্যতা, নেতৃত্বের গুণাবলি ও জনপ্রিয়তা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া কমপক্ষে তিনজনের সুপারিশ মনোনয়ন বোর্ডের কাছে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

(চ) মহানগর, থানা ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে মতপার্থক্য হইলে তাহা তাহারা সুপারিশে উল্লেখ করিতে পারিবেন।

(ছ) মনোনয়ন বোর্ড আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একজন প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে।

২৯. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল (পার্লামেন্টারি পার্টি)

(১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে সমস্ত সদস্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবেন, তাহারা জাতীয় সংসদের আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল গঠন করিতে ও উহার নিজস্ব কর্মকর্তা নির্বাচন করিতে বাধ্য থাকিবেন। সংসদীয় দলভুক্ত প্রত্যেক সদস্য আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিবেন। সংসদীয় দলের সংখ্যাগুরু সদস্যদের সিদ্ধান্তই দলের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; কিন্তু এই সংসদীয় দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের মূলনীতি বা কোনো বিধানের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের একজন নেতা ও একজন উপনেতা থাকিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সংসদীয় দল অন্যান্য কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি ও পূরণ করিতে পারিবেন।

(৩) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের সদস্যগণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের উপদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় তাহাদের বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ ২৪(৩) প্রযোজ্য হইবে।

(৪) (ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল এই ধারার

(খ) উপধারা মতে কর্মকর্তা নির্বাচন করিবার পর কর্মকর্তাগণ এক বৈঠকে মিলিত হইয়া তাহাদের নিজ নিজ কার্যাবলি স্থির করিয়া লইবেন। কিন্তু যদি ইহা স্থির করিতে তাহারা অক্ষম হন, তাহা হইলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ উহা চূড়ান্তভাবে স্থির করিয়া দিবে।

(৫) জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সদস্যগণ সংসদীয় দলের (পার্লামেন্টারি পার্টি) তহবিলে মাসিক ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তহবিলে ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা, জেলা/মহানগর আওয়ামী লীগ তহবিলে ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা এবং উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ তহবিলে ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা, সর্বমোট ৩০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩০. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক সম্পর্ক, মর্যাদা ও কাঠামো

(১)(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অধীনে ঢাকা (উত্তর-দক্ষিণ), চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ মহানগরে জেলার মর্যাদাসম্পন্ন একটি করিয়া মহানগর ও প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলা আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে।

(খ) প্রত্যেক জেলা আওয়ামী লীগের অধীনে প্রতিটি উপজেলা/থানায় একটি করিয়া উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে।

(গ) মহানগর আওয়ামী লীগের অন্তর্গত প্রতিটি থানায় একটি করিয়া থানা আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হইবে।

(ঘ) মহানগরের ওয়ার্ডসমূহের প্রতিটিতে একটি করিয়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে। এক্ষেত্রে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মর্যাদাসম্পন্ন হইবে।

(ঙ) মহানগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে একাধিক ইউনিট আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে এবং এক্ষেত্রে ইউনিট আওয়ামী লীগ ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের মর্যাদাসম্পন্ন হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মহল্লা আওয়ামী লীগ কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(চ) প্রত্যেক থানা আওয়ামী লীগের অধীনে প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ এবং পৌর এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে। পৌর এলাকায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মহল্লা কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(ছ) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অধীনে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাম কমিটি গঠন করিতে হইবে।

(জ) ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠন করার পূর্বে প্রত্যেক গ্রাম হইতে প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১৫০ জন প্রাথমিক সদস্য থাকিতে হইবে।

(ঝ) বিভিন্ন জেলায় পুলিশ থানার অন্তর্গত ইউনিয়নসমূহ নিয়ে সাংগঠনিক থানা আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে।

(ঞ) জেলা সদরে অবস্থিত পৌর আওয়ামী লীগসমূহ সাংগঠনিক থানার মর্যাদা এবং অন্যান্য পৌর আওয়ামী লীগসমূহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মর্যাদাসম্পন্ন হইবে। পৌর আওয়ামী লীগসমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে থানা/ইউনিয়ন শাখার ন্যায় কর্মকর্তা নির্বাচন করিবে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও থানা/ইউনিয়ন শাখার নিয়মাবলি অনুসরণ করিবে।

(২) বিভিন্ন শাখা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাঠামোসমূহ

(ক) জেলা আওয়ামী লীগ ৩৯ জন কর্মকর্তা ও ৩৬ জন সদস্যসহ মোট ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(খ) মহানগর আওয়ামী লীগ ৩৯ জন কর্মকর্তা ও ৩৬ জন সদস্যসহ মোট ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(গ) উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ ৩৬ জন কর্মকর্তা ও ৩৫ জন সদস্যসহ মোট ৭১ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(ঘ) পৌর আওয়ামী লীগ (জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভা) ৩৬ জন কর্মকর্তা ও ৩৫ জন সদস্যসহ মোট ৭১ সদস্য বিশিষ্ট হইবে। জেলা সদর ব্যতীত অন্যান্য পৌর আওয়ামী লীগ ৩২ জন কর্মকর্তা ও ৩৭ সদস্যসহ মোট ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(ঙ) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ৩২ জন কর্মকর্তা ও ৩৭ জন সদস্যসহ মোট ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(চ) ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ২৪ জন কর্মকর্তা ও ২৭ জন সদস্যসহ মোট ৫১ সদস্য বিশিষ্ট হইবে। *ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ (মহানগর) ৩২ জন কর্মকর্তা ও ৩৭ জন সদস্যসহ মোট ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(ছ) ইউনিট আওয়ামী লীগ (মহানগর) ২০ জন কর্মকর্তা ও ১৭ জন সদস্যসহ মোট ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(জ) গ্রাম/মহল্লা আওয়ামী লীগ ২০ জন কর্মকর্তা ও ১১ জন সদস্যসহ মোট ৩১ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

৩১. জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল

(১) বাংলাদেশের প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলায় নিম্নরূপে নির্বাচিত কাউন্সিলরগণকে লইয়া একটি জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা–

(ক) উপজেলা/থানার মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি ১০ হাজারে একজন করিয়া কাউন্সিলর উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল কর্তৃক জেলা কাউন্সিলের জন্য নির্বাচিত হইবেন। জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্য কাউন্সিলর হইবেন।

(খ) প্রতি জেলা কাউন্সিল কর্তৃক উহার ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী সভার প্রথম অধিবেশনে প্রতি উপজেলা/থানা হইতে কাউন্সিলর হিসেবে কো-অপশনকৃত পাঁচজন সদস্য।

(২) জেলা আওয়ামী লীগ ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ নির্বাচন করিবে। ইহা ছাড়া নির্দিষ্ট সংখ্যক কেন্দ্রীয় কাউন্সিলরও নির্বাচন করিবে।

(৩) জেলা কাউন্সিল অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলর তালিকা অবশ্যই উপস্থাপিত এবং অনুমোদিত হইতে হইবে। অন্যথায় ওই জেলার কোনো কাউন্সিলর তালিকা অনুমোদন পাইবে না।

(৪) গঠনতন্ত্রের ২৬(৩) অনুচ্ছেদ মোতাবেক ২১ জন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

৩২. (১) জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ কাউন্সিল সভায় উপস্থিত থাকিলে কোরাম হইবে।

(২) প্রত্যেক কাউন্সিলরকে প্রতি তিন বৎসরের জন্য ২০০ (দুই শত) টাকা হারে চাঁদা দিতে হইবে।

(৩) জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলরদের দেয় উক্ত চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে জেলা নির্বাহী সংসদ গঠনতন্ত্রের ৯ ও ১০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৩৩. জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ

(১) প্রত্যেক জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও সদস্যগণসহ মোট ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(ক) সভাপতি
(খ) সহ-সভাপতি ১১ জন
(গ) সাধারণ সম্পাদক
(ঘ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তিনজন
(নিম্নের পদগুলি পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত হইবে)
(ঙ) আইন বিষয়ক সম্পাদক
(চ) কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
(ছ) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
(জ) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(ঝ) দফতর সম্পাদক
(ঞ) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

(ট) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
(ঠ) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(ড) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
(ঢ) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(ণ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(ত) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(থ) শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
(দ) শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক
(ধ) শ্রম সম্পাদক
(ন) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(প) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(ফ) সাংগঠনিক সম্পাদক তিনজন
(ব) উপ-দফতর সম্পাদক
(ভ) উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ – একজন
(কর্মকর্তা ৩৯ জন) ও সদস্য ৩৬ জন = মোট ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট।

(২) জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সাধারণ সভায় এক-তৃতীয়াংশ ও জরুরি সভায় এক-চতুর্থাংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে।

৩৪. জেলা সম্পর্কিত যে সমস্ত বিষয়ে এই গঠনতন্ত্রে কোনো উল্লেখ নাই, সে সমস্ত বিষয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিয়মাবলি প্রযোজ্য হইবে। জেলা আওয়ামী লীগের অধীনস্থ উপজেলা/থানা, পৌর, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, গ্রাম এবং মহানগর আওয়ামী লীগের অধীনস্থ থানা, ওয়ার্ড ও ইউনিট আওয়ামী লীগ কমিটি গঠনে ব্যর্থ হইলে জেলা/মহানগর আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্রের ৬(৩) ও ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৩৫. মহানগর আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত কমিটিসমূহ

(১) ইউনিট আওয়ামী লীগ

মহানগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের অধীনে একাধিক ইউনিট আওয়ামী লীগ থাকিবে। প্রতিটি ইউনিটে ন্যূনপক্ষে ১৫০ জন প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক প্রাথমিক সদস্য ওই ইউনিটের কাউন্সিলার বলিয়া গণ্য হইবেন।

নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও সদস্য সমন্বয়ে ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিট আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হইবে।

(ক) সভাপতি
(খ) সহ-সভাপতি তিনজন
(গ) সাধারণ সম্পাদক
(ঘ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুইজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
(ঙ) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(চ) দফতর সম্পাদক
(ছ) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(জ) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
(ঝ) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(ঞ) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(ট) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(ঠ) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(ড) শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
(ঢ) শ্রম সম্পাদক
(ণ) সাংস্কৃতিক সম্পাদক
(ত) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(থ) সাংগঠনিক সম্পাদক
(কর্মকর্তা ২০ জন) ও সদস্য ১৭ জন = মোট ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট।

(২) মহানগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ

(ক) মহানগর ওয়ার্ডসমূহে একটি করিয়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে। মহানগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মর্যাদাসম্পন্ন হইবে। মহানগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্য কাউন্সিলর হবেন। প্রতি ইউনিট থেকে ১৯ জন করিয়া কাউন্সিলর এবং কো-অপশনকৃত ১৫ জন কাউন্সিলর নিয়ে মহানগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কাউন্সিল গঠিত হইবে।

(খ) মহানগরের যে সকল ওয়ার্ড একাধিকভাবে বিভক্ত হইয়া একাধিক থানায় অবস্থিত আছে, সে সকল ক্ষেত্রে ওয়ার্ডের জনসংখ্যার ভিত্তিতে বৃহত্তম অংশ যে থানায় অবস্থিত, ওই ওয়ার্ডকে সেই থানার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(গ) মহানগর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা–

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি সাতজন
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তিনজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
৫. আইন বিষয়ক সম্পাদক
৬. কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
৭. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
৮. ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
৯. দফতর সম্পাদক
১০. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১৪. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
১৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
১৬. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
১৭. শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
১৮. শ্রম সম্পাদক
১৯. সাংস্কৃতিক সম্পাদক
২০. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
২১. সাংগঠনিক সম্পাদক তিনজন
২২. সহ-দফতর সম্পাদক
২৩. সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ – একজন

(কর্মকর্তা ৩৪ জন) ও সদস্য ৩৫ জন = মোট ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট।

(ঘ) থানা আওয়ামী লীগ (মহানগরসহ সকল পুলিশ থানা) কাউন্সিল

মহানগর আওয়ামী লীগের অন্তর্গত প্রতিটি থানায় একটি করিয়া থানা আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে।

(ঙ) থানা আওয়ামী লীগ গঠন প্রণালিতে ৩৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুসরণে প্রতি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড হইতে ৩১ জন নির্বাচিত কাউন্সিলর ও কো-অপশনকৃত ১৫ জন কাউন্সিলর লইয়া থানা ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন হইবে, থানা আওয়ামী লীগের

কার্যনির্বাহী সংসদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্য কাউন্সিলর হইবে এবং মহানগর থানা, জেলাধীন উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগের অনুরূপ কর্মকর্তা ও সদস্য থাকিবে।

(চ) থানা আওয়ামী লীগের (মহানগর ও পুলিশ থানা) কমিটি

নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা–

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি ৯ জন
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তিনজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
৫. আইন বিষয়ক সম্পাদক
৬. কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
৭. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
৮. ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
৯. দফতর সম্পাদক
১০. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১৪. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
১৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
১৬. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
১৭. শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
১৮. শ্রম সম্পাদক
১৯. সাংস্কৃতিক সম্পাদক
২০. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
২১. সাংগঠনিক সম্পাদক তিনজন
২২. সহ-দফতর সম্পাদক
২৩. সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ – একজন

(কর্মকর্তা ৩৬ জন) ও সদস্য ৩৫ জন = মোট ৭১ সদস্য বিশিষ্ট।

৩৬. মহানগর আওয়ামী লীগ কাউন্সিল

(১) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরের অন্তর্গত থানার মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি ২০ হাজারে একজন করিয়া থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে মহানগর কাউন্সিলর

নির্বাচিত হইবে। মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ কাউন্সিলর হইবেন।

(২) রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ মহানগর থানার প্রতি ওয়ার্ড হইতে ১২ জন করিয়া কাউন্সিলর থানা কাউন্সিল অধিবেশনে মহানগর কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত হইবে।

(৩) প্রতি মহানগর আওয়ামী লীগ ইহার প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে প্রতি থানা হইতে পাঁচজন করিয়া কাউন্সিলর কো-অপশন করিবে।

(৪) অনুচ্ছেদ ৩৬-এ উল্লেখিত কাউন্সিলরদের প্রত্যেককে ত্রি-বার্ষিক ২০০ (দুই শত) টাকা হারে চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

৩৭. মহানগর আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ

(১) প্রতি মহানগর আওয়ামী লীগ ইহার কাউন্সিল অধিবেশনে নিম্নরূপ কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন করিবে, যথা–

(ক) সভাপতি
(খ) সহ-সভাপতি ১১ জন
(গ) সাধারণ সম্পাদক
(ঘ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তিনজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
(ঙ) আইন বিষয়ক সম্পাদক
(চ) কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
(ছ) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
(জ) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
(ঝ) দফতর সম্পাদক
(ঞ) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
(ট) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
(ঠ) বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
(ড) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
(ঢ) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
(ণ) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
(ত) যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
(থ) শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
(দ) শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক
(ধ) শ্রম সম্পাদক
(ন) সাংস্কৃতিক সম্পাদক

(প) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
(ফ) সাংগঠনিক সম্পাদক তিনজন
(ব) সহ-দফতর সম্পাদক
(ভ) সহ-প্রচার সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ – একজন
(কর্মকর্তা ৩৯ জন) ও সদস্য ৩৬ জন = মোট ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট।

(২) মহানগরের বিভিন্ন স্তরের কমিটির সহিত সমন্বয় রাখিয়া সহযোগী সংগঠনের সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবে এবং পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করিবে।

৩৮. উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল

প্রতি উপজেলা/থানায় একটি করিয়া উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে। উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা–

(ক) প্রতি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ হইতে নির্বাচিত ৩১ জন কাউন্সিলর।
(খ) উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল কর্তৃক ইহার ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী সভায় প্রথম অধিবেশনে কো-অপশনকৃত ১৫ জন কাউন্সিলর লইয়া উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে।
(গ) উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ কাউন্সিলর হইবেন।
(ঘ) অনুচ্ছেদ ৩৮-এ উল্লেখিত কাউন্সিলরের প্রত্যেককে ত্রি-বার্ষিক ১০০ (এক শত) টাকা হারে চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

৩৯. উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ

উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন করিবে এবং অন্যান্য ব্যাপারে উহার প্রতি জেলার নিয়মাবলি প্রযোজ্য হইবে–

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি ৯ জন
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তিনজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
৫. আইন বিষয়ক সম্পাদক
৬. কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
৭. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
৮. ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক

৯. দফতর সম্পাদক
১০. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১৪. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
১৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
১৬. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
১৭. শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
১৮. শ্রম সম্পাদক
১৯. সাংস্কৃতিক সম্পাদক
২০. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
২১. সাংগঠনিক সম্পাদক তিনজন
২২. সহ-দফতর সম্পাদক
২৩. সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ – একজন
(কর্মকর্তা ৩৬ জন) ও সদস্য ৩৫ জন = মোট ৭১ সদস্য বিশিষ্ট।

৪০. ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ

(১) প্রত্যেক জেলা আওয়ামী লীগের অন্তর্গত থানাসমূহের প্রতিটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সমন্বয়ে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে।

(২) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্য কাউন্সিলর হবেন এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ হইতে ১৯ জন করিয়া কাউন্সিলর এবং কো-অপশনকৃত ১৫ জন কাউন্সিলর সমন্বয়ে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে।

(৩) উপ অনুচ্ছেদ ২-এ উল্লিখিত কাউন্সিলরদের প্রত্যেককে ত্রি-বার্ষিক ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ৩২ জন কর্মকর্তা ও ৩৭ জন সদস্যসহ মোট ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

(৫) ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা–

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি সাতজন
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুইজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
৫. আইন বিষয়ক সম্পাদক
৬. কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
৭. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
৮. ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
৯. দফতর সম্পাদক
১০. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১৪. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
১৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
১৬. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
১৭. শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
১৮. শ্রম সম্পাদক
১৯. সাংস্কৃতিক সম্পাদক
২০. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
২১. সাংগঠনিক সম্পাদক দুইজন
২২. সহ-দফতর সম্পাদক
২৩. সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ – একজন
(কর্মকর্তা ৩২ জন) ও সদস্য ৩৭ জন = মোট ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট।

৪১. (১) প্রত্যেক ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করিয়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠিত হইবে। প্রত্যেক ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমপক্ষে ১৫০ জন করিয়া প্রাথমিক সদস্য অবশ্যই সংগ্রহ করিতে হইবে। ওয়ার্ড আওয়ামী লীগই প্রাথমিক ইউনিট হিসেবে গণ্য হইবে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাম আওয়ামী লীগ গঠন করিতে হইবে।

(ক) ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ২৪ জন কর্মকর্তা ও ২৭ জন সদস্যসহ মোট ৫১ সদস্য বিশিষ্ট হইবে।

ইহার গঠন-কাঠামো হইবে নিম্নরূপ–

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি পাঁচজন
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুইজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
৫. কৃষিও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
৬. ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
৭. দফতর সম্পাদক
৮. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
৯. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১০. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১১. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
১২. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
১৪. শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
১৫. শ্রম সম্পাদক
১৬. সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১৭. সাংগঠনিক সম্পাদক দুইজন
* কোষাধ্যক্ষ – একজন
(কর্মকর্তা ২৪ জন) ও সদস্য ২৭ জন = মোট ৫১ সদস্য বিশিষ্ট।

৪২. পৌর আওয়ামী লীগ

প্রত্যেক পৌর এলাকায় নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে পৌর আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে–

(১) পৌর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্য কাউন্সিলর হবেন এবং প্রত্যেক ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ হইতে নির্বাচিত ১৯ জন করিয়া কাউন্সিলর;

(২) পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল সভার প্রথম অধিবেশনে কো-অপশনকৃত ১৯ জন কাউন্সিলর;

(৩) পৌর আওয়ামী লীগসমূহ ৩০(ঞ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন করিবে এবং অন্যান্য ব্যাপারে ইউনিয়ন বা ক্ষেত্রমতে উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগের নিয়মাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(ক) পৌর আওয়ামী লীগ কমিটি (জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভা)

নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা-

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি ৯ জন
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তিনজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
৫. আইন বিষয়ক সম্পাদক
৬. কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
৭. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
৮. ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
৯. দফতর সম্পাদক
১০. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১৪. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
১৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
১৬. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
১৭. শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
১৮. শ্রম সম্পাদক
১৯. সাংস্কৃতিক সম্পাদক
২০. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
২১. সাংগঠনিক সম্পাদক তিনজন
২২. সহ-দফতর সম্পাদক
২৩. সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ – একজন
(কর্মকর্তা ৩৬ জন) ও সদস্য ৩৫ জন = মোট ৭১ সদস্য বিশিষ্ট।

(খ) পৌর আওয়ামী লীগ কমিটি (জেলা সদর ব্যতীত অন্যান্য পৌরসভা)

নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা-

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি সাতজন
৩. সাধারণ সম্পাদক

৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুইজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
৫. আইন বিষয়ক সম্পাদক
৬. কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
৭. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
৮. ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
৯. দফতর সম্পাদক
১০. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১৪. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
১৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
১৬. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
১৭. শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
১৮. শ্রম সম্পাদক
১৯. সাংস্কৃতিক সম্পাদক
২০. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
২১. সাংগঠনিক সম্পাদক দুইজন
২২. সহ-দফতর সম্পাদক
২৩. সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ – একজন
(কর্মকর্তা ৩২ জন) ও সদস্য ৩৭ জন = মোট ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট।

(৪) জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভা উপজেলা আওয়ামী লীগ মর্যাদা এবং উপজেলা সদর ও অন্যান্য পর্যায়ের সকল শ্রেণির পৌরসভা সাংগঠনিকভাবে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ মর্যাদা সম্পন্ন হবে। একইভাবে জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভার ওয়ার্ডসমূহ ইউনিয়ন শাখার মর্যাদা সম্পন্ন হইবে।

(ক) পৌর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ

জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্য কাউন্সিলর হইবে। মহল্লা/ইউনিট শাখা হতে ১৯ জন করিয়া কাউন্সিলর এবং কো-অপশনকৃত ১৫ জন কাউন্সিলর সমন্বয়ে জেলা শহরে অবস্থিত পৌরসভার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কাউন্সিল গঠিত হইবে।

(খ) পৌর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কমিটি (জেলা সদরে অবস্থিত পৌরসভা)

নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা–

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি সাতজন
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুইজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
৫. আইন বিষয়ক সম্পাদক
৬. কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
৭. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
৮. ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
৯. দফতর সম্পাদক
১০. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১৪. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
১৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
১৬. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
১৭. শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
১৮. শ্রম সম্পাদক
১৯. সাংস্কৃতিক সম্পাদক
২০. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
২১. সাংগঠনিক সম্পাদক দুইজন
২২. সহ-দফতর সম্পাদক
২৩. সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ– একজন
(কর্মকর্তা ৩২ জন) ও সদস্য ৩৭ জন = মোট ৬৯ সদস্য বিশিষ্ট।

(৫) জেলা সদর ব্যতীত সকল পৌর আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটি ওয়ার্ড প্রাথমিক ইউনিট রূপে গণ্য হইবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১৫০ জন সদস্য সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রাথমিক সদস্যগণই ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ক) পৌর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কমিটি (জেলা সদর ব্যতীত অন্যান্য পৌরসভা)

নিম্নরূপে গঠিত হইবে, যথা–

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি পাঁচজন
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুইজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
৫. আইন বিষয়ক সম্পাদক
৬. কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
৭. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক
৮. ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
৯. দফতর সম্পাদক
১০. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
১১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১২. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক
১৪. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
১৫. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
১৬. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
১৭. শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
১৮. শ্রম সম্পাদক
১৯. সাংস্কৃতিক সম্পাদক
২০. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
২১. সাংগঠনিক সম্পাদক দুইজন
২২. সহ-দফতর সম্পাদক
২৩. সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
* কোষাধ্যক্ষ – একজন
(কর্মকর্তা ৩০ জন) ও সদস্য ২১ জন = মোট ৫১ সদস্য বিশিষ্ট।

৪৩. গ্রাম/মহল্লা আওয়ামী লীগ

প্রত্যেক গ্রামে বা মহল্লায় একটি করিয়া গ্রাম বা মহল্লা আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হইবে। নিম্নরূপ কর্মকর্তা ও সদস্য সমন্বয়ে গ্রাম/মহল্লা আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হইবে–

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি তিনজন

৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দুইজন
(পদের আদ্যাক্ষরের ক্রমানুসারে)
৫. কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক
৬. ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক
৭. দফতর সম্পাদক
৮. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
৯. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
১০. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক
১১. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক
১২. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক
১৩. যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক
১৪. শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক
১৫. সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১৬. স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক
১৭. সাংগঠনিক সম্পাদক
(কর্মকর্তা ২০ জন) ও সদস্য ১১ জন = মোট ৩১ সদস্য বিশিষ্ট।

৪৪. অনুচ্ছেদ ৪৩এ উলেখিত গ্রাম/মহল্লা আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্যগণই যথাক্রমে প্রত্যেক শাখার কাউন্সিলর বলিয়া গণ্য হইবেন ।

৪৫. প্রত্যেক ইউনিয়ন, পৌর বা ইউনিট আওয়ামী লীগের সকল কর্মকর্তা ও প্রত্যেক কার্যনির্বাহী সদস্যকে ত্রি-বার্ষিক ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে চাঁদা দিতে হইবে।

৪৬. জেলা, মহানগর, উপজেলা, থানা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভা ও কার্যনির্বাহী সংসদের সভার ক্ষেত্রে যথাক্রমে গঠনতন্ত্রের ১৫ ও ২৩ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে।

৪৭. প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা

(১) কোনো সদস্য আওয়ামী লীগের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিলে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল, কার্যনির্বাহী সংসদ, সংসদীয় বোর্ড বা সংসদীয় পার্টির বিরুদ্ধে কোনো কাজ করিলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ তাহার বিরুদ্ধে যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় কমিটির নিকট সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে আপিল করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) আপিলের আবেদন সাধারণ সম্পাদক প্রাপ্তি রসিদ গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় কমিটির নিকট পেশ করিবেন। অন্যথায় জাতীয় কমিটির যে কোনো সদস্য সভাপতির অনুমতি লইয়া বিষয়টি বিবেচনা ও সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উত্থাপন করিতে পারিবেন।

(৪) জাতীয় কমিটিকে সভা আহ্বানের সাত দিনের মধ্যে উক্ত আপিলের দরখাস্ত সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করিতে হইবে। সাধারণ সম্পাদক এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়গুলি জাতীয় কমিটির কার্যসূচিভুক্ত করিবেন ।

(৫) শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার জন্য সুযোগদানের উদ্দেশ্যে যুক্তিসংগত সময় দিয়া সাধারণ সম্পাদক পোস্টাল রেজিস্ট্রেশনযোগে নোটিস প্রদান করিবেন ।

(৬) সংগঠনের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে শাস্তি প্রদানের জন্য আওয়ামী লীগের নিম্নতম যে কোনো শাখা বা যে কোনো সদস্যের লিখিত অভিযোগপত্র পাওয়ার পর উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ নিজেদের সিদ্ধান্তসহ উক্ত অনুরোধপত্র জেলা কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট পাঠাইবেন। জেলা কার্যনির্বাহী সংসদ এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উক্ত বিষয় বিবেচনাপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট প্রেরণ করিবেন। এতদ্‌সত্ত্বেও জেলা আওয়ামী লীগ স্বয়ং সংগঠনের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ করিলে জেলা কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৭) অনুচ্ছেদ ১৭(৬)-এর বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কেবল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের থাকিবে।

(৮) এই অনুচ্ছেদের আওতায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শাখা আওয়ামী লীগকে তাহার ঊর্ধ্বতন শাখার নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। যে কোনো শাখা আওয়ামী লীগের মধ্যে সংগঠন-সংক্রান্ত কোনো গোলযোগ বা বিরোধ দেখা দিলে ঊর্ধ্বতন শাখা উহা নিষ্পত্তি

করিতে পারিবে। এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট আপিল করা যাইবে এবং সেই ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) সংগঠনের যে কোনো শাখা তাহার যে কোনো কর্মকর্তা বা সদস্যকে দলের স্বার্থ, আদর্শ, শৃঙ্খলা তথা গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের জন্য স্ব-স্ব পদ বা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে। তবে এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন শাখার অনুমোদন প্রয়োজন হইবে এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাখার সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। ঊর্ধ্বতন শাখা পরববর্তী এক মাসের মধ্যে তাহার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট শাখাকে জানাইবে, অন্যথায় গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত ঊর্ধ্বতন শাখা একমত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) যে কোনো বহিষ্কারের বিষয়ে জেলা কমিটির সুপারিশের পর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হইলেই কেবল চূড়ান্তভাবে বহিষ্কৃত হইবে এবং অপরাধ প্রমাণিত না হইলে শাস্তি প্রদান করা যাইবে না । কার্যনির্বাহী সংসদ তিন মাসের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, অন্যথায় অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ বলিয়া গণ্য হইবে।

(১১) জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কেহ দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হইলে দল হইতে সরাসরি বহিষ্কার হইবেন এবং যাহারা দলীয় প্রার্থীর বিরোধিতা করিবেন, তাহারা তদন্তসাপেক্ষ মূল দল বা সহযোগী সংগঠন হইতে বহিষ্কৃত হইবেন।

৪৮. প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ সংগঠনের নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একজন চেয়ারম্যান সহ সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে এবং এই ট্রাইব্যুনালের ওপর এতদসংক্রান্ত যে কোনো ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারিবে। এই ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট আপিল করা যাইবে । এই ধরণের আপীলের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৯. আওয়ামী লীগ তহবিল

(১) (ক) প্রত্যেক কাউন্সিলরের ২০০.০০ (দুই শত) টাকা হারে চাঁদা;

(খ) কার্যনির্বাহী সংসদের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে চাঁদা;

(গ) জাতীয় সংসদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলভুক্ত প্রত্যেক সদস্যের মাসিক ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে চাঁদা;

(ঘ) প্রত্যেক জেলার মঞ্জুরি ফি বাবদ ২০০.০০ (দুই শত) টাকা;
(ঙ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচারপত্র, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা ও অন্যান্য প্রকাশনার বিক্রয়লব্ধ অর্থ;
(চ) এককালীন দান/অনুদান;
(ছ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ;
(জ) সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ;
(ঝ) সাহায্য ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ;
(ঞ) প্রাথমিক সদস্য-শ্রেণিভুক্ত হওয়ার ও নবায়নের জন্য দেয় ত্রি-বার্ষিক চাঁদার অংশ।

(২) জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ তহবিল

(ক) জেলা বা মহানগর আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সদস্যদের প্রত্যেকের ত্রি-বার্ষিক ২০০.০০ (দুই শত) টাকা হারে চাঁদা;
(খ) জেলার প্রত্যেক উপজেলা/থানা, পৌর এবং মহানগর আওয়ামী লীগের অধীনস্থ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের মঞ্জুরি ফি বাবদ ১০০.০০ (এক শত) টাকা;
(গ) সকল কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী সংসদ সদস্যের ৫০০.০০ (পাঁচ শত) মাসিক চাঁদা;
(ঘ) জাতীয় সংসদে স্থানীয় আওয়ামী লীগ দলভুক্ত সদস্যের মাসিক ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা হারে চাঁদা;
(ঙ) এককালীন দান/অনুদান;
(চ) প্রাথমিক সদস্য হওয়ার ও নবায়নের জন্য দেয় ত্রি-বার্ষিক চাঁদার অংশ।

(৩) উপজেলা/থানা আওয়ামী লীগ তহবিল

(ক) প্রত্যেক কাউন্সিলারের ত্রি-বার্ষিক ১০০.০০ (এক শত) টাকা হারে চাঁদা;
(খ) প্রত্যেক ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মঞ্জুরি ফি বাবদ ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা;
(গ) জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ দলভুক্ত স্থানীয় সংসদ সদস্যের ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা হারে মাসিক চাঁদা;
(ঘ) উপজেলা/থানা কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের মাসিক চাঁদা ১০০.০০ (এক শত) টাকা
(ঙ) এককালীন দান/অনুদান;
(চ) প্রাথমিক সদস্য হওয়ার ও নবায়নের জন্য দেয় ত্রি-বার্ষিক চাঁদার অংশ।

(৪) ইউনিয়ন, পৌর, ওয়ার্ড এবং মহানগর অন্তর্ভুক্ত ইউনিট আওয়ামী লীগ তহবিল

(ক) কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী সংসদ সদস্যদের নির্দিষ্ট হারে মাসিক চাঁদা;

(খ) কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী সংসদ সদস্যদের জন্য ত্রি-বার্ষিক ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা চাঁদা;

(গ) এককালীন দান/অনুদান;

(ঘ) প্রাথমিক সদস্য হওয়ার ও নবায়নের জন্য দেয় ত্রি-বার্ষিক চাঁদার অংশ।

(৫) আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের তহবিল

(ক) অনুচ্ছেদ ২৯(৫) অনুসারে সংসদীয় পার্টির প্রত্যেক সদস্যের মাসিক ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে চাঁদা;

(খ) এককালীন দান/অনুদান।

৫০. আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্যশ্রেণিভুক্ত হওয়ার জন্য দেয় ত্রি-বার্ষিক ২০ (বিশ) টাকা চাঁদা নিম্নোক্ত হারে বিভিন্ন শাখার মধ্যে ভাগ করা হইবে;

(১) প্রাথমিক ইউনিট ৮.০০ (আট) টাকা;

(২) উপজেলা/থানা ৪.০০ (চার) টাকা;

(৩) জেলা ৪.০০ (চার) টাকা;

(৪) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪.০০ (চার) টাকা;

(৫) মহানগরের অন্তর্গত ইউনিট আওয়ামী লীগ ৪.০০ (চার) টাকা, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ৪.০০ (চার) টাকা, থানা আওয়ামী লীগ ৪.০০ (চার) টাকা, মহানগর আওয়ামী লীগ ৪.০০ (চার) টাকা এবং অবশিষ্ট ৪.০০ (চার) টাকা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পাইবে।

৫১. আওয়ামী লীগ তহবিল পরিচালনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয়, জেলা, মহানগর, ওয়ার্ড, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন বা পৌর ইউনিট যে সকল চাঁদা বা দান গ্রহণ করিবে, তাহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রাখিতে হইবে। আদায়কৃত অর্থ বাংলাদেশের যে কোনো তফসিলিভুক্ত ব্যাংকে জমা রাখা হইবে। ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ নিজ নিজ শাখার সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে উঠানো যাইবে। ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলের সময় সকল শাখার সাধারণ সম্পাদকগণ তাহাদের নিজ নিজ শাখার আয়-ব্যয়ের হিসাব আগে অডিট করাইয়া সম্মেলনে পেশ করিবেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল এবং নির্বাচন কমিশনে আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হবে।

৫২. নির্বাচন পরিচালনা কমিশন

(১) সংগঠনের প্রত্যেকটি স্তরে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্য সমন্বয়ে একটি নির্বাচন কমিশন কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদ্বয় সংশ্লিষ্ট স্তরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

(২) সংগঠনের সকল জেলা, মহানগর, উপজেলা/থানা শাখা স্ব-স্ব ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনেই অনুচ্ছেদ ৫২(১) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে।

(৩) নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করিবে। সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উহা বাস্তবায়ন করিবে।

(৪) নির্বাচন কমিশন যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর তালিকা সংরক্ষণ করিবে ও যথাসময়ে নিয়মানুযায়ী প্রকাশ করিবে।

(৫) ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী কাউন্সিল অধিবেশনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন যুক্তিসংগতভাবে সংশ্লিষ্ট শাখার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবেন।

(৬) নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করিবেন এবং সকল কর্মকর্তা পদে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করিবেন। সর্বশেষ নির্বাচিত কর্মকর্তাদের তালিকা কাউন্সিলরদের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন।

(৭) কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্যের পদ শূন্য হইলে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী সংসদ অবিলম্বে সেই শূন্য পদ পূরণ করিবে।

৫৩. বিবিধ বিধান

(১) জেলা, মহানগর, ওয়ার্ড, উপজেলা/থানা, পৌর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ বৎসরে অন্তত একবার বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করিবে। ইহা ছাড়া এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত রিকুইজিশনপত্র সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করার ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক অধিবেশন আহ্বান করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় অনুচ্ছেদ ১২

(২) অনুসারে রিকুইজিশনকারী সদস্যগণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

৫৪. বর্ধিত সভা

জেলা, মহানগর, ওয়ার্ড, উপজেলা/থানা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ বৎসরে অন্তত তিনবার অর্থাৎ চার মাস অন্তর স্ব-স্ব শাখায় বর্ধিত সভা আহ্বান করিবে। বর্ধিত

সভায় নিম্নস্থ শাখাসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ অবশ্যই আমন্ত্রিত হইবেন। বর্ধিত সভার লিখিত রিপোর্ট ঊর্ধ্বতন শাখা বা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতার নিকট পেশ করিতে হইবে।

৫৫. জেলা মহানগরী, থানা, পৌর, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন এবং গ্রাম আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সভা অন্ততপক্ষে মাসে একবার আহ্বান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত রিকুইজিশনপত্র প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী সংসদের সভা আহ্বান করিতে বাধ্য থাকিবেন। অন্যথায় রিকুইজিশনকারী সদস্যগণ ৫৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

৫৬. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সভা আহ্বানের জন্য ২১ জন সদস্যের রিকুইজিশনপত্র প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও রিকুইজিশনপত্রের এক কপি প্রতিষ্ঠানের সভাপতির নিকট প্রদান করিতে হইবে। রিকুইজিশনপত্র প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক বা সভাপতি সভা আহ্বান না করিলে রিকুইজিশনকারী সদস্যগণ নিজেরাই সাত দিনের নোটিস প্রদান করিয়া সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

৫৭. আওয়ামী লীগের কোনো সদস্য অন্য কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইতে পারিবেন না, কিংবা অন্য কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের অনুমতি ছাড়া কোনোরূপ রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না।

৫৮. (১) অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো ভূতপূর্ব বা বর্তমান সদস্য আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য শ্রেণিভুক্ত হইতে চাহিলে তিনি তাহার নিজ জেলার জেলা আওয়ামী লীগের অনুমতি চাহিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের নিকট পত্র দিবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সম্মতি ছাড়া উপরিউক্ত কোনো ব্যক্তিকে আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্যভুক্ত করা যাইবে না।

(২) তবে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত উপ-অনুচ্ছেদ (১)-এর আওতায় আবেদনকারী ব্যক্তির মনঃপুত না হইলে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করিতে পারিবেন এবং এই বিষয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। তবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ ইচ্ছা করিলে সরাসরি যে কোনো ব্যক্তিকে প্রাথমিক সদস্যভুক্ত হইবার অনুমতি দিতে পারিবে।

(৩) প্রত্যেক অবস্থাতেই নবাগত সদস্যগণ এক বৎসরের মধ্যে আওয়ামী লীগের কোনো কর্মকর্তার পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তবে প্রয়োজনবোধে সংগঠনের স্বার্থে সভাপতি এই বিধানের ব্যতিক্রম করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষ কর্মকর্তা হিসেবে গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৯. (১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে কোনো কর্মকর্তা বা কার্যনির্বাহী সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের যে কোনো সদস্য আওয়ামী লীগের নিম্নতর যে কোনো শাখার যে কোনো সভার অধিবেশনে যোগদান করিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে ও পরামর্শ দিতে পারিবেন; তবে তিনি ভোট দিতে পারিবেন না।

(২) প্রত্যেক জেলা, মহানগর, উপজেলা/থানা, পৌর আওয়ামী লীগের যে কোনো কর্মকর্তা অথবা কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য নিম্নতম যে কোনো শাখার যে কোনো সভা বা অধিবেশনে যোগদান করিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে ও পরামর্শ দিতে পারিবেন; তবে তিনি ভোট দিতে পারিবেন না।

৬০. এই গঠনতন্ত্রে যেসব বিষয়ে উল্লেখ নাই, সেই সকল বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ বা জাতীয় কমিটির থাকিবে।

৬১. (১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনী, বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশনের অনুমোদনসাপেক্ষ কার্যনির্বাহী সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে এই উপ-অনুচ্ছেদের বিধান ব্যতিরেকে অন্যান্য বিধান বা যে কোনো বিধান বা তাহার অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করা যাইবে । তবে শর্ত থাকে যে, ইহা আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হইবে এবং পরবর্তী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যেই যদি কাউন্সিল সভা আহ্বান করা হয়, তবে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের ভোটেই উহা করা যাইবে।

(৩) কাউন্সিলের ত্রি-বার্ষিক, বার্ষিক বা বিশেষ অধিবেশনকে উপঅনুচ্ছেদ ২-এ উল্লিখিত কাউন্সিল হিসেবে গণ্য করিতে হইলে কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বানের নোটিসে উক্ত বিষয়টি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৬২. (১) কোনো স্তরেই আহ্বায়ক বা এডহক কমিটির মেয়াদ ছয় মাসের বেশি হইবে না এবং আহ্বায়ক বা এডহক কমিটির সদস্যের সংখ্যা মূল কমিটির সদস্য সংখ্যার বেশি হইতে পারিবে না।

(২) জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ প্রয়োজনবোধে ঊর্ধ্বতন কমিটির সম্মতিক্রমে আঞ্চলিক আওয়ামী লীগ গঠন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজন বিবেচনায় থানা বা ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড কমিটির ন্যায় কর্মকর্তা ও সদস্য নির্বাচন করিতে পারিবে।

(৩) দলীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণ তাহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দলের মতামত ও পরামর্শ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিবেন।

(৪) দলীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণ প্রতি তিন মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট জেলা ও থানা আওয়ামী লীগের সাথে মতবিনিময় করিবেন।

(৫) জেলা ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে সহযোগী সংগঠন স্ব-স্ব আওয়ামী লীগ কমিটির সহিত সমন্বয় রাখিয়া কাজ করিবে এবং পরস্পরকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করিবে।

৬৩. আওয়ামী লীগের কোনো সদস্য সংগঠনের একাধিক স্তরে কর্মকর্তা থাকিতে পারিবেন না। যদি তিনি এক স্তরে কর্মকর্তা থাকা অবস্থায় অন্য কোনো স্তরে নির্বাচন করিতে চান, তবে তিনি পূর্বের কর্মকর্তার পদ হইতে পদত্যাগ না করিয়া পরবর্তী স্তরের কর্মকর্তা পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না।

৬৪. (১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ সহযোগী সংগঠনসমূহের কার্যাবলি মূল রাজনৈতিক ধারার সহিত সমন্বয় রাখিয়া পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজনবোধে উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং সেই মোতাবেক সহযোগী সংগঠনসমূহের কার্যাবলি তত্ত্বাবধান ও তাহাদের সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(২) সহযোগী সংগঠনসমূহের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ কর্তৃক কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের এক বা একাধিক কর্মকর্তা/সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ভিন্ন ভিন্ন স্টিয়ারিং কমিটি সভাপতির পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে কাজ করিবে।

৬৫. প্রবাসে সংগঠন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিভিন্ন দেশে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালি জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী সংগঠন করিতে পারিবে।

৬৬. অস্থায়ী বিধান

২০১৯ সালের ২০ ও ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে উপস্থিত কাউন্সিলরগণ কর্তৃক সংশোধিত এই গঠনতন্ত্র ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ হইতে কার্যকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান কমিটিসমূহ বহাল থাকিবে এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সিদ্ধান্ত অনুসরণে সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্ব-স্ব স্তরের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন কমিটি নির্বাচন করিবে।

পরিশিষ্ট (ক)

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সদস্যপদের জন্য আবেদন

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

জনাব
আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বাসপূর্বক নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিয়া ৫(১) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক সদস্যপদের জন্য/সদস্যপদ নবায়ন/পুনরুজ্জীবনের জন্য আবেদন জানাইতেছি। আমি সকল সময়ে দলের গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলি এবং ঘোষণাপত্র, কর্মসূচি ও সকল সিদ্ধান্ত মানিয়া চলার অঙ্গীকার করিতেছি।

নিম্নে আমার ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করা হইল–

নাম : .....

মাতার নাম : .....

পিতা/স্বামীর নাম : .....

পেশা : .....

বয়স : .....

জাতীয় পরিচয়পত্র নং : .....

মোবাইল নং : .....

ই-মেইল : .....

(ক) বর্তমান ঠিকানা

গ্রাম/মহল্লা : .....

ওয়ার্ড : .....

ইউনিয়ন : .....

উপজেলা/থানা : .....

জেলা : .....

(খ) স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম/মহল্লা : .....

ওয়ার্ড : ..... ইউনিয়ন : .....

উপজেলা/থানা : .....

জেলা : .....

ফোন : ..... বাসা : .....

অফিস : .....

রাজনৈতিক অবস্থান : .....

আপনার বিশ্বস্ত

আবেদনকারীর স্বাক্ষর : .....

প্রস্তাবকারীর নাম ও সাংগঠনিক পরিচয় : .....

প্রস্তাবকারীর নাম ও সাংগঠনিক পরিচয় : .....

প্রস্তাবকারীর ঠিকানা : .....

তারিখ :

সদস্যপদের স্বীকৃতি/অস্বীকৃতি : .....

নাম : ..... পদবি : .....

স্বাক্ষর : .....

পরিশিষ্ট (খ)

(প্রথম অংশ)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সদস্যপদ নবায়ন/প্রাথমিক সদস্যপদের জন্য আবেদন

ক্রমিক নং : ..... তারিখ : .....

সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

জনাব
আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বাস করিয়া নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করিয়া ৫(১) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রাথমিক সদস্যপদের জন্য/সদস্যপদ নবায়নের জন্য আবেদন জানাইতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর : .....

নাম : .....

পিতা/স্বামী : .....

মাতা : .....

ঠিকানা : .....

পরিশিষ্ট (খ)

(দ্বিতীয় অংশ)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সদস্য

ক্রমিক নং : .....
তারিখ : .....

নাম : .....
পিতা/স্বামী : .....
মাতা : .....
সাং : .....
ডাকঘর : .....
উপজেলা/থানা : .....
জেলা : .....

আপনার/আপনাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সদস্যপদ নবায়ন/প্রাথমিক সদস্যপদ প্রদান করা হইল।

সাধারণ সম্পাদক	সাধারণ সম্পাদক	সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	জেলা/নগর আওয়ামী লীগ	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ, রমনা, ঢাকা-১০০০

ফোন: ৯৬৭৭৮৮১, ৯৬৭৭৮৮২, ৮৬৫২৩৮৮, ফ্যাক্স: ৯৬৬৬৫৫০

ই-মেইল: alparty1949@gmail.com

www.albd.org